রমেশদা'র আত্মকথা

পঞ্চম সংস্করণ

শ্রী রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, প্রণীত

বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী
পোঃ আমাহার্স্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১০৫

মূল্য এক টাকা বারো আনা

Publisher—K.C. Acherya, 24, Amherst Row, Calcutta, and Printed
by—Khairul Anam Khan, at the Mohommadi Press,
91, Upper Circular Road, Calcutta.

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

একজন কোরিয়াবাসী জাপ সম্রাটের উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল, কিন্তু সম্রাটের অঙ্গে কোন আঘাত লাগে নাই। তদন্তে প্রকাশ পাইয়াছে—কোরিয়ার সামরিক শাসন পরিষদের নিকট হইতে আততায়ী দুইটি বোমা ও ১৫টি স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সম্রাটের উপর বোমা নিক্ষেপের ষড়যন্ত্র পূর্বাহ্ণে আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হওয়ায় নিজদিগকে এজন্য পরোক্ষে দায়ী মনে করিয়া মন্ত্রীসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়াছেন।

ইটালির বৈদেশিক বিভাগের এক সভ্য ব্যভিচারের জন্য সংবাদপত্রে নিন্দিত হওয়ায় তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের রাষ্ট্রীয় পরিষদ, ব্যবস্থাপক সভা, বিচারক, রাজদত্ত উপাধিপ্রাপ্ত [ভারতীয় প্রজা] রাজা, মহারাজ, স্যর, রায় বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু প্রতিপত্তিশালী পরস্ত্রী অপহারক ও পরদারগামী এবং ব্যভিচারী, যাহারা অর্থের জোরে সমাজ এবং রাজকার্য পরিচালনা করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রে ঘোর উচ্ছৃঙ্খলতা আনয়ন করিয়াছেন ও করিতেছেন, সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য রমেশদা'র আত্মকথায় তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে। নীতি সংযমহীন বর্তমান উচ্চশিক্ষাও যে পূর্বকালের শিক্ষা হইতে হীন, তাহা আমার নিজের এবং এই সকল তথাকথিত নেতাদের চরিত্র পাঠে দেশের ও সমাজের বিশেষ উপকার হইবে বিবেচনায় তাহাও আলোচিত হইয়াছিল। ফলে অশ্লীলতার অভিযোগে প্রকাশক প্রভৃতি তিন ব্যক্তির তিন মাসের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের আদেশ হওয়ায় ওই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল চলিতেছে। সুতরাং বর্তমানে এ বিষয়ে নীরব থাকা সমীচীন।

স্বাধীন দেশ ও পরাধীন দেশের এই পার্থক্য।

রমেশদা'র আত্মকথার আমি লেখক, আমার পরিচয় পত্র এবং ফটো পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে এবং আমার বর্তমান আবাসস্থলও পূর্ব মোকদ্দমায় এক বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল ; কিন্তু কোন মোকদ্দমায় আমাকে আসামি শ্রেণিভুক্ত করা হয় নাই। কর্তাদের অনেকের নিকট আমি সুপিরিচিত ; আইনের ভয়ে পুস্তকে যাহা লিখিতে পারি নাই, মোকদ্দমায় তাহা খুলিয়া বলিলে দেশে একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া যাইত, ইহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই কি প্রত্যেকবারই আমাকে অনুগ্রহ দেখাইতে বাধ্য হইয়াছেন?

তৃতীয় সংস্করণের পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর সুবিজ্ঞ ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত বি. সি. চ্যাটার্জি মহোদয়ের লিখিত অভিমত গ্রহণ করিয়া পুস্তক বিক্রয় হয়। মিঃ চ্যাটার্জির মত অভিজ্ঞ ব্যারিস্টার যে পুস্তকখানাকে দোষশূন্য বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং "গ্রন্থকার এই পুস্তক দ্বারা দেশের কাজ (Public service) করিয়াছেন" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন তাহারই ফলে প্রকাশক প্রভৃতি আজ কারাদণ্ডের অপেক্ষায় জামিনে মুক্ত আছেন।

এই মোকদ্দমার ঘটনাস্থল জোড়াবাগান পুলিশ কোর্টের এলাকাধীন কিন্তু কী উদ্দেশ্যে সরকারপক্ষ তাহা ব্যাঙ্কশাল কোর্টে বিচারের জন্য পাঠাইয়াছিলেন তাহা আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই। অনারেবল সুশীলকুমার সিংহ আই. সি. এস. ব্যাঙ্কশালের প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁহার ভগিনী (সহোদরা) শ্রীযুক্তা রমলা গুপ্তার পতন কাহিনী 'রমেশদার আত্মকথায়' আছে। সুতরাং তাঁহারই কোর্টে ইহার সুবিচারের উপযুক্ত স্থান মনে করিয়াই সরকারপক্ষ এই আইনানুমোদিত কার্য করিয়াছিলেন কি?

প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট যাহাতে এই মোকদ্দমার বিচার না করেন এজন্য কারণ প্রদর্শন করিয়া লিখিত আবেদন করিলেও অনারেবল সিংহ মহাশয় তাহা অগ্রাহ্য করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। অনন্যোপায় হইয়া আসামিগণ হাইকোর্টে এ বিষয়ে আবেদন করিবার জন্য সময় প্রার্থনা করেন। ইহার দুই দিন পর অনারেবল সিংহ মহাশয় আসামির অন্যতম উকিলকে ডাকিয়া বলেন যে "হাইকোর্টে দরখাস্ত করা না হইয়া থাকিলে এ বিষয় পুনঃবিচেনার জন্য একটা দরখাস্ত করুন। আমি অন্য কোর্টে পাঠাইয়া দিতেছি।"

শ্রীযুক্তা রমলা গুপ্তা মিউনিসিপাল ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এন. গুপ্তের স্ত্রী। ইঁহারা খ্রিস্টান। স্বল্পসংখ্যক এ দেশিয় শিক্ষিত উচ্চশ্রেণির খ্রিস্টান পরিবার পরস্পর আত্মীয়তা এবং বন্ধুত্বে আবদ্ধ থাকা খুবই সম্ভব। পুস্তকে উল্লিখিত এ দেশিয় খ্রিস্টান নার্স অনিলাও হয়ত বিচারকদের সম্পর্কিতা হইতে পারেন। এই সকল কারণে কোন মুসলমান বিচারকের নিকট এই মোকদ্দমার বিচারের ভার অর্পণ করিবার জন্য দরখাস্ত দিতে উকিলবাবুকে বলা হইল। উকিলবাবু এই প্রস্তাবে ভয় পাইলেন, বলিলেন—"ইহাতে সকল হাকিমই চটিয়া যাইবেন, বিশেষত ব্যাঙ্কশালে অপর দুজন বিচারকই দেশিয় খ্রিস্টান। জোড়াবাগানের বিচার্য মোকদ্দমা যখন কোন অজ্ঞাত কারণে এখানে আনা হইয়াছে তখন তাহা আর অন্য স্থানে যাইবে না।" যে উকিল দ্বারা পুনর্বিবেচনার জন্য দরখাস্ত দেওয়া হইল, তিনিও এ বিষয়ে অসম্মতি জানাইলেন। অতঃপর কিম্!

আসামিদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ—ষড়যন্ত্র ও অশ্লীল সাহিত্য প্রচার। অশ্লীলতা সম্বন্ধে আইনের এমন কোন সীমা নির্দেশ নাই যে ইহা শ্লীল এবং উহা অশ্লীল। যে সাহিত্য পড়িলে মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তি জাগরিত হয় তাহাকেই সাধারণত অশ্লীল বলা যায়। এই মোকদ্দমায় সরকার পক্ষে বঙ্গ বিহার ও আসামের প্রায় চল্লিশ জন সাক্ষী উপস্থিত করা হইয়াছিল কিন্তু তাঁহাদের একজনও পুস্তকখানাকে অশ্লীল বলিতে পারেন নাই। অধিকন্তু কেহ কেহ পুস্তকখানা বর্তমান সমাজের পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয় বলিয়াছেন। অপর পক্ষে সর্বজনমান্য কয়েক জন অভিজ্ঞ সাহিত্যিক বলিয়াছেন যে পুস্তকে কোন অশ্লীলতা নাই। সমাজ সংস্কারের জন্য এই পুস্তক বিশেষ আবশ্যক। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি বহু নভেল হইতে 'রমেশদা'র আত্মকথা' শ্লীলতা-পূর্ণ, একথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন।

'রমেশদা'র আত্মকথা'য় কবি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা মুদ্রিত হইয়াছিল, সরকার

পক্ষ ওই কবিতাকেও অশ্লীল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন কিন্তু কবিকে আইনের জালে ফেলিতে বোধ হয় সাহসী হন নাই।

বহুদিন যাবৎ প্রচলিত সাহিত্য, যাহা বাংলার সাহিত্যরথীদিগের উচ্চশ্রেণির কাব্য সাহিত্যরূপে পরিচিত, তাহার ভাব ও ব্যঞ্জনা হইতে সাহিত্যরূপে যে পুস্তক উচ্চস্তরের সেই পুস্তকের জন্যই এই দণ্ড।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তিনি যে শ্লীলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার কতকগুলি কবিতা 'রবীন্দ্র জয়ন্তী রহস্যে' মুদ্রিত হইল। [এই লেখাটি মূল প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্নবোধে এই সংস্করণে বর্জিত]।

চিত্রাঙ্গদায় কবি রবীন্দ্রনাথ 'অনঙ্গ আশ্রমে' অর্জুন, বসন্ত ও চিত্রাঙ্গদার যে রমণ বিলাসের চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা নির্ভীক সমালোচক কর্তৃক তৎকালে বিশেষ প্রশংসিত হইযাছিল।

উপন্যাস সম্রাট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চরিত্রহীন পুস্তকে তিনি যে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া প্রভূত যশের অধিকারী হইয়াছেন তাহা হইতে একটু নমুনা এখানে দেওয়া হইল।

(দিবাকর ভ্রাতৃবধূ কিরণময়ীর সঙ্গে অবৈধ প্রেমে আসক্ত ছিল। উভয়ে পরামর্শ করিয়া বাংলা ছাড়িয়া জাহাজে আরাকান যাইতেছে, জাহাজের কেবিনে কিরণময়ী শুইয়াছিল)। সে (কিরণময়ী) সুদৃঢ় বলের সহিত দিবাকরকে বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"জাহাজ যদি ডোবে আমরা যেন এমনি করেই মরি। তীরে এসে ভেসে যাব, লোকে দেখবে, ছাপার কাগজে উঠবে, তোমার উপীন দাদা পড়বে সে কেমন হবে ঠাকুরপো!"[১]

ছাইকোলজির নামে এ চিত্রও বিনা বাধায় কাটিয়া যায় কিন্তু ইহা যদি "বিভাস" বাবুর সঙ্গে 'কমলার' ছাইকোলজি হইত তবে হয়ত এভাবে চলিত না।

বোমার মোকদ্দমার আসামি নরেন গোঁসাই ও বারীণ ঘোষ পুলিশের নিকট নিজেদের সব গোপন কথা খুলিয়া বলিয়া দেয়। এই অপরাধে গোঁসাইয়ের বরাতে ঘটিল মৃত্যু, আর আদুরে গোপাল বারীণ ঘোষ, শ্রীঅরবিন্দের ছোট ভাই, আদুরে গোপাল হইয়াই রহিলেন।[২] এক যাত্রায় এই যে পৃথক ফল ইহার কৈফিয়ত দিবে কে?

অশ্লীলতার অভিযোগে এদেশে বোধ হয় এই প্রথম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে এবং আইনের শেষ সীমা তিন মাসই প্রকাশকদিগের ভাগ্যে মিলিয়াছে। ইহাতে আমরা দুঃখিত, অনুতপ্ত অথবা মোটেই আশ্চর্য হই নাই। কারণ পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হইবার সময় আমরা ইহা ভাবিয়াই তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম এবং প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলা হইয়াছিল—

"পুস্তকের নানা ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অনেকেই বিশেষ উচ্চপদস্থ, অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী। পুস্তকখানিকে কিংবা ইহার লেখক ও প্রকাশককে গলা টিপিয়া মারিবার

জন্য কোন চেষ্টা করিতেই যে তাহারা কসুর করিবে না তাহা আমরা জানি ; কারণ পৃথিবীতে এমন কোন দুষ্কার্য নাই, যাহা তাহাদের নিকট কুকার্য বলিয়া পরিগণিত। তাহাদের একটা কথা মনে রাখা উচিৎ যে পাপ কখনও ঢাকা থাকিবে না, আজ ইহার গলা টিপিয়া বধ করিলে কালই ইহার ভস্ম গায় মাখিয়া আরও দশখানা পুস্তক প্রকাশিত হইবে।"

আমাদের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে। ইহার প্রকাশ বন্ধ করা একেবারেই অসম্ভব—অধিকন্তু বন্ধ করিবার চেষ্টা করায় "মুকুলদার মর্মকথা" বাহির হইয়াছে।

আমাদিগকে জেলে পাঠাও আর ফাঁসি দাও আমরা নির্ভীক চিত্তে তাহা বরণ করিয়া লইব। আমরা জানি হিন্দু সমাজের জন্য এই পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন আছে, সুতরাং ইহার প্রকাশ কেহ বন্ধ করিতে পারিবে না। এই পুস্তক দ্বারা প্রকৃত হিন্দু সমাজের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। সত্য বটে, ব্যভিচারীদের অনেকেই পুস্তকখানাকে ভাল চোখে দেখিতে পারেন না, কারণ তাঁহাদের ভবিষ্যতের ভয় আছে।

শ্রদ্ধাভাজন সাহিত্যিক ও এড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী এম. এ. বি. এল. মহাশয় বর্তমান সংস্করণে পুস্তকখানা (শেষ অধ্যায় ব্যতীত) আদ্যন্ত সংশোধন করিয়া দিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। এড্‌ভোকেট ডাঃ পাল, মিঃ এস্ বসু, মিঃ এ. রায় ও সরকার এবং অন্যান্য কয়েকজন উকিল ও সাহিত্যিক বন্ধুও এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করায় তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীরমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

অবাধ মেলামেশা ও ভদ্রমহিলার নৃত্যের শোচনীয় পরিণামের দৃষ্টান্ত চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবার জন্য বুনিয়াদি পরিবারের কয়েকটি ঘটনা নাম ধাম সহ প্রকাশিত হওয়ায় কোন রুচিবাগীশ সাহিত্যিক ও এক নগণ্য সম্পাদক পুস্তকে অশ্লীলতার দোষারোপ করিয়া মেঘের আড়াল হইতে বাণ নিক্ষেপ করিয়া ইহার প্রচার বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পুস্তকে কাহার কোথায় ব্যথা লাগিয়াছে তাহা আমরা—আমরা কেন অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে পরবর্তী সংস্করণে ব্যথিতদের স্বরূপ প্রকাশ করিব।

এই সকল সুরুচির উপাসকগণ কোন ভদ্রমহিলা ক্ষণিক ভুলে সাময়িক স্খলিতা হইলে, ঐ সংবাদ টীকা টিপ্পনী সহ (সমাজের উপকারের জন্য!) সংবাদ পত্রে মুদ্রিত করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন না। কৌশল্যা, বরদা, সুভাষিণী, লীলাবতী, শোভনা হরণ, মঞ্জুল বসু ও নিরুপমা দেবীর স্বামী ত্যাগের কারণ, রমলা গুপ্তার ফরাসীদেশ ভ্রমণ প্রভৃতি সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া দেশ বিদেশে ইহাদের এমন পরিচিতা করিয়া দিয়াছেন যে, ইহাদের হারাইলে তাহাদের কি শোচনীয় পরিণাম ঘটিতে পারে তাহা সম্পাদকগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? এই প্রকার প্রচারের ফলে বহু নারী পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করিতেও বাধ্য হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। জানিতে ইচ্ছা হয়—কোন মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা এই সকল সংবাদ পত্রিকায় স্থান দিয়া থাকেন। সুরুচির মাপ কাঠিটা তখন কোথায় থাকে?

আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ যে সকল বড় ঘরের নারীর পরিচয় দিয়াছি তাহারা সকল সমাজের বাহিরে। এই দৃষ্টান্তে সমাজের উপকার হইতে পারে, তাহাদের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। অমরা মহাজন পন্থা অবলম্বন ব্যতীত আর কিছুই করি নাই।

জননীর স্তন হইতেই শিশু দুগ্ধই গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু জলৌকা বা জোঁক সেই স্তন হইতেই রুধির ভিন্ন কিছুই পায় না—দোষ কি স্তনের। নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্ত আনাতোল ফ্রাঁস[৩], নুট্ [য] হামসুন[৪], মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভব[২] প্রভৃতি কাব্য, রবীন্দ্রনাথের কাব্য, মোপাসাঁর[৫] গল্প অথবা বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা সমাজহিতকর এই গ্রন্থখানাকে অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট বলিবেন না, তাহা আমরা স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি।

এই পুস্তক যে তরলমতি বালক-বালিকাগণের জন্য প্রকাশিত হয় নাই তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিবেন। যুবক-যুবতীদের অভিভাবক ও অভিভাবিকা এবং সমাজসংস্কারকদিগের সাহায্যার্থ ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পাঠে সমাজের দুষ্ট ব্রণগুলি উৎপাটিত করিতে কিংবা নৈতিক কুষ্ঠব্যাধি গ্রস্থ ব্যক্তিদিগকে সমাজ হইতে দূর করিতে একজনও যদি প্রয়াস পান তবে প্রকাশকের পরিশ্রম সফল হইয়াছে মনে করিব।

প্রকাশকের নিবেদন

প্রশ্ন হইতে পারে, এ পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্য কি? সমাজের যখন ভাল মন্দ দুইটা দিক আছে, তখন মন্দের দিকটা বিশেষ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না!

সমাজের ভাল দিকটাতো অনেকেই দেখাইয়াছেন ও দেখাইতেছেন, তাহাতে সমাজকে পাপমুক্ত করিতে কোন সাহায্য হইতেছে বলিয়া মনে হয় না।

কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তিকে নিরাময় করিতে গিয়া রোগীর সম্মুখীন হইতে ভয় করিলে যেমন চলে না, সমাজকে ব্যভিচারের স্রোত হইতে রক্ষা করিতে হইলেও তেমনি তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে।

পুত্র যদি পিতাকে ধূমপান করিতে দেখে, তাহা হইলে সেই পুত্রেরও ধূমপানে আসক্তি হওয়া স্বাভাবিক। আচার-ভ্রষ্ট শিক্ষকের দৃষ্টান্তে ছাত্রও কদাচারী হইয়া থাকে। তেমনি—শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায় যেখানে ব্যভিচার-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে, অপর লোক তাহাদের অনুসরণ করিবে বই কি! কংগ্রেস, কাউন্সিল, করপোরেশন, বণিক সমিতি প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে যাঁহারা উচ্চ আসন পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যদি ব্যভিচার দোষে দুষ্ট হ'ন তবে দেশবাসী জন-সাধারণই কেন ব্যভিচারকে দোষণীয় জ্ঞান করিবে, কিংবা ব্যভিচারকেই ঐ সকল উচ্চ পদে উন্নীত হইবার শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে না করিবে। প্রকৃতপক্ষেও হইতেছে তাহাই।

এই সকল মার্কামারা ব্যভিচারী ব্যতীত কতকগুলি অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী লোক পরস্ত্রীকে কুলের বাহির করিয়াও দেশে সম্মান পাইতেছেন, এমন কি বিচারপতি মাননীয় নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, বেদান্তাচার্য হীরেন্দ্রনাথ দত্ত', সঞ্জীবনী সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি সর্বজনমান্য ব্যক্তিগণও ইহাদিগকে সম্মানের আসন দিয়া থাকেন। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ না জানিলেও সমাজের অনেকেই ইহাদের কুকীর্তি সমূহ অবগত আছেন।

অধুনা নিন্দিত পল্লীবাসিনী [তথাকথিত নিষিদ্ধ পল্লী বা সোজা কথায় বেশ্যাপাড়া] পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের কন্যা কমলা দেবী, ইটালীর [এন্টালি] মুখার্জি পরিবারের কন্যা, জুনিয়ার ক্যাম্ব্রিজ পরীক্ষোত্তীর্ণা অতুলনীয়া সুন্দরী কুমারী সুকৃতি দেবী, খড়দহের গোস্বামী পরিবারের কন্যা সরযূ দেবী, বড়িশা চৌধুরী পরিবারের বধু সরলা দেবী, বেহালার হালদার পরিবারের কন্যা দেববালা, অনিলা ও সুনিলা দেবী, শ্যামবাজারে সেন শর্মা পরিবারের কন্যা কুমারী গৌরী দেবী, বাগবাজারের সাহিত্যিক পণ্ডিতের স্ত্রী মনোরমা ও কন্যা পরিমল, তারকেশ্বরের বালবিধবা কৃষ্ণভামিনী, ভবানীপুরের ব্যারিস্টার ঘোষ বর্মা পরিবারের কন্যা প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত মহিলাদের কুলের বাহির করিয়াও যাহারা অর্থের জোরে সম্মান আদায় করিতেছে তাহাদের পরিচয় গ্রহণ করিয়া পাষণ্ডদিগকে সমাজ হইতে

তাড়াইয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া যে অবশ্য কর্তব্য, সমাজহিতৈষীগণকে তাহা হৃদয়ঙ্গম কবাইবার জন্যই এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।

ছোট বড় অনেক কাজের জন্যই এখন যুবকগণ সত্যাগ্রহ করিতেছেন। সমাজের এই সকল কলঙ্ক দূর করিবার জন্যও তাঁহাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত নহে কি?

পুস্তকে বর্ণিত একটি ঘটনাও মিথ্যা নহে ; উৎসুক পাঠকগণ যাহাতে সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারেন, সেইদিকে লক্ষ রাখিয়া স্ত্রী চরিত্রগুলির বিশদ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থোক্ত পুরুষদিগের বিশেষ পরিচয়ও ওই সকল নারীগণের নিকট পাওয়া যাইবে। সাময়িক স্খলিতা নারীদিগের মধ্যে যাঁহারা বিবাহিত সামাজিক জীবনযাপন করিতেছেন তাঁহাদের পরিচয় গোপন করা হইয়াছে।

পুস্তকের নানা ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অনেকেই বিশেষ উচ্চপদস্থ, অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী। পুস্তকখানিকে কিংবা ইহার লেখক ও প্রকাশককে গলা টিপিয়া মারিবার জন্য কোন চেষ্টা করিতেই যে তাহারা কসুর করিবে না তাহা আমরা জানি ; কারণ পৃথিবীতে এমন কোন দুষ্কার্য নাই, যাহা তাহাদের নিকট সুকার্য বলিয়া পরিগণিত। তাহাদের একটা কথা মনে রাখা উচিত যে পাপ কখনও ঢাকা থাকে না এবং তাঁহার ফলভোগ করিতেই হইবে। আজ ইহাদের গলা টিপিয়া বধ করিলে কালই ইহার ভস্ম গায় মাখিয়া আরও দশখানা পুস্তক প্রকাশিত হইবে।

পুস্তকোল্লিখিত নানা ঘটনায় সম্পর্কিত অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদিগের স্তাবক ও অনুগৃহীত সমালোচকগণ, সমালোচনার আবরণে ইহাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতে পারেন ; তাহাতে তাঁহাদের নিজেদেরই স্বরূপ প্রকাশিত হইবে মাত্র!

যে সকল কাহিনি প্রকাশিত হইল তাহার সত্যতা সম্বন্ধে আমরা সমাজের নানা শ্রেণির বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে স্বাক্ষীস্বরূপে উল্লেখ করিতে পারি। এই সকল ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহাদের কাহারো বা প্রত্যক্ষ এবং কাহারো কাহারো পরোক্ষভাবে জ্ঞান আছে বলিয়া আমরা অবগত হইয়াছি। এমন কি মহাত্মা গান্ধীও একটা ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তাঁহার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত দেশাইকে কোন স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী এবং বিবিধ কার্যে অগ্রণী মহারাজ স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর[৮], স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র, স্যার নীলরতন সরকার[৯], কুমার মন্মথনাথ মিত্র, কুমার প্রদ্যুৎকৃষ্ণ দেব, মহামহোপাধ্যায় শ্যামাদাস বাচস্পতি[১০], মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন শর্মা, মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ[১১], শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ কর, রায় বাহাদুর তারকনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র [য], শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার[১২], ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়[১৩] ও বাংলার প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণকে আমাদের কাহিনির সত্যাসত্য নির্ণয়

বর্তমান নেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন[১৪], শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু[১৫],
এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র

করিয়া সমাজের এই ব্যভিচারস্রোত নিবারণ জন্য বদ্ধপরিকর হইতে অনুরোধ করিতেছি।

মানদা দেবী তাহার আত্মচরিতে গ্রন্থকারকে রমেশদা' বলিয়া পরিচিত করায় এই পুস্তকের নামকরণ "রমেশদা'র আত্মকথা" করা হইল।

শ্রীমতী কমলা দেবী

(পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের কন্যা)

পুরুষটির পরিচয় লিখিতে অসমর্থ বলিয়া মুখে চুনকালি লেপন করিয়া দেওয়া হইল, ইনি কে বুদ্ধিমান পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

[লেখক প্রদত্ত পরিচিতি]

কুমারী সুকৃতি দেবী

(ইটালির [এন্টালির] মুখার্জী পরিবারের কন্যা)

[লেখক প্রদত্ত পরিচিতি]

কুমারী সরযূ দেবী

বেহালার হালদার পরিবারের কন্যা

ইনি খড়দহের গোস্বামী পবিবারের কন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

[লেখক প্রদত্ত পরিচিতি]

গোড়ার কথা

মহাত্মা গান্ধি তাঁহার আত্ম-জীবন চরিত লিখিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ জীবন স্মৃতি লিখিয়াছেন, নবীনচন্দ্রও তাঁহার জীবনের কাহিনি বাংলার পাঠকগণকে উপহার দিয়াছেন—আর আমি শ্রীরমেশচন্দ্রও আমার জীবন কথা আজ লিখিতে বসিয়াছি। তোমরা হয়তো এইটুকু পড়িয়াই চটিয়া উঠিবে, বলিয়া বসিবে—"কে তুমি হে বাপু? কোন দিন তোমার নামও শুনি নাই, আর এই সব জগদ্বিখ্যাত নামের সঙ্গে তুমি তোমার নাম করিতেছ, তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়?"—বলিতে পার, বলিলে তোমাদিগকে বিশেষ দোষও দিতে পারি না, কারণ বাংলার পাঠক তোমরা অধিকাংশই পরের মুখে ঝাল খাইতে শিখিয়াছ। বড় বড় নাম শুনিলেই তোমাদের ভাবাবেশ হয়—বোঝ আর নাই বোঝ বড় বড় লোকের কথা শুনিলেই দশ জনের সুরে সুর মিলাইয়া তোমরা বাহবা দেও—মনের নিভৃত কোণে জাগে কিন্তু ভয়, বাহবা না দিলে লোকে মনে করিবে যেন এ লোকটা সমজদার নয়। সুতরাং আমার মত একজন নগণ্য লোকের আত্ম-জীবন চরিত লেখার চেষ্টাকে তোমরা উপহাস করিতেও পারে। কিন্তু আমার অনুরোধ, উপহাস কর আর যাই কর—আমার এই জীবনের কাহিনিটা একবার পড়িও। তোমাদের মধ্যে হাজার করা নয়শত নিরানব্বুইটির পক্ষে গান্ধির আদর্শে জীবন গঠন করিবার সাধ্য নাই। কারণ তিনি "অতি মানুষ" কিন্তু আমার জীবন চরিতখানা যদি পড় তবে যে সকল প্রলোভনে পরিয়া উচ্চ বংশে জন্ম, উচ্চ সংসর্গে মিশিবার সুযোগ প্রভৃতি সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পদাধিকারী [ডিগ্রিধারী] আমি শ্রীরমেশচন্দ্র আজ মাতাল লম্পট জুয়াচোরে পরিণত হইয়াছি। সেই সকল প্রলোভন যদি এড়াইয়া চলিতে পার, তাহা হইলে অন্তত মানুষ বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে পারিবে, একথা আমি স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি।

তবে সত্যের অনুরোধে একথাও আমি বলিতে বাধ্য যে কেবল মাত্র অহেতুকী পরোপকার প্রবৃত্তি আমাকে এই আত্মজীবন চরিত লিখিতে প্রণোদিত করে নাই; সে কথা যদি বলি তাহা হইলে কপটতা করা হইবে। এ জীবনে একটা কথা ঠেকিয়া শিখিয়াছি, তাহা এই যে কপটতায় লাভ হয় না। আপাতত লাভ হইলেও পরিণামে এত অধিক ক্ষতি হয় যে তাহাতে মজুরি পোষায় না। সুতরাং একথা আমি খুলিয়া বলাই প্রয়োজন মনে করিতেছি যে, আমার এই জীবন কথার প্রকাশক মহাশয় আমার এই জীবন চরিতের বিনিময়ে কিঞ্চিৎ রজতমুদ্রা (যাহার অভাবে আমার মৌতাত বন্ধ হইবার মত হইয়াছিল) আমার পকেটে না দিতেন—তাহা হইলে কেবল মাত্র তোমাদের উপকারের জন্য আমি এই পরিশ্রম স্বীকার করিতাম কিনা সন্দেহ। তারপর এই জীবন চরিত লিখিতে আমার প্রবৃত্তি আরও একটি কারণে জাগিয়া উঠিয়াছে। মানদাসুন্দরী ওরফে পতিতা মানদা দেবী আমার

নাম এক প্রকার বঙ্গবিখ্যাত করিয়া দিয়াছে। তাহার জীবন চরিতে আমি যে বর্ণে চিত্রিত হইয়াছি তাহাতে দেশবাসী আমাকে কি চক্ষুতে দেখিয়াছেন, তাহাও আমার বুঝিতে বাকি নাই। আমার দুর্বলতা আমি অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু আমার জীবন চরিত পড়িলে অন্তত দেশবাসী বুঝিতে পারিবেন যে কি প্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, কাল এবং সঙ্গের ফলে আমার এই অধঃপতন। তাঁহারা ইহাও জানিতে পারিবেন তাহার [মানদার] নিজের ত্রুটি অনেকখানি ঢাকিয়া আমার ঘাড়েই তাহার সর্বনাশের কারণ সম্পূর্ণ ভাবে চাপাইয়াছে।*

আর একটা কথা বলিয়াই আমি আমার এই ভূমিকা শেষ করিব। সে কথাটি এই যে, আমার এই জীবন চরিতে আমার জীবনের কোন কথা আমি গোপন করি নাই। মনীষী রোমাঁ রোলাঁ বলিয়াছেন—

"If we are to tell a hundredth part of the dreams that come to an ordinary honest man, or of the desire which come into being in the body of a chaste woman ; there would be a scandal and an outcry."

অর্থাৎ—“সাধারণত যাঁহারা সচ্চরিত্র পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক বলিয়া জগতে পরিচিত, তাঁহাদের মনের গোপন কোণে যে সকল চিন্তা জাগে এবং তাঁহাদের দেহে যে সকল লালসা লোক চক্ষুর অন্তরালে রাজত্ব করে তাহার শতাংশের এক অংশও যদি প্রকাশ করিয়া বলা যায় তাহা হইলে সমাজে একটা বিষম হৈ চৈ উপস্থিত হইবে।”

এই কথাটির সত্যতা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছি, সমাজে একটা ঘোরতর আন্দোলনের সৃষ্টি হইবে এই আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও আমি অকপটে আমার মনের ভাব প্রকাশ করিব। কারণ আমার বিশ্বাস যাঁহারা মনের কোণে কল্পনার সুন্দর পরিচ্ছদে পাপকে সাজাইয়া লইয়া, তাহার মধুর মূর্তি দেখিয়া মুগ্ধ হন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয়তো সেই পাপের নগ্ন বীভৎস মূর্তি দেখিলে চমকিয়া উঠিবেন এবং হয়ত সময় থাকিতে সাবধান হইতে পারিবেন। তবে আমার জীবন-নাটকে সহকর্মী হিসাবে যে সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রী অভিনয় করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের নাম ধাম প্রবাশ করিবার অধিকার আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। কারণ তাঁহাদের অনেকেরই সাধুপুরুষ এবং সাধ্বী স্ত্রী বলিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা আছে। আমার মত বেপরোয়া ছন্নছাড়া কেহই নহেন। সুতরাং তাঁহাদের সেই প্রতিষ্ঠা খর্ব করিয়া, এই শেষ জীবনে তাঁহাদের অভিশাপ কুড়াইয়া লইতে আমি ইচ্ছুক নহি। সেই জন্য তাঁহাদের নাম গোপন করিয়া ছদ্মনাম এই আখ্যায়িকায় ব্যবহার করিয়াছি।

---

* **গ্রন্থের সর্বত্রই গুরু হরফ লেখকের নয়, সংকলকের।**

রমেশদা'র আত্মকথা

বাংলা ১২৯২ সনের ৩০শে আশ্বিন [১৮৮৫ খ্রিঃ] তারিখে হুগলি জেলায়...গ্রামে আমার জন্ম হয়, আমার পিতা বিশেষ সঙ্গতিপন্ন না হইলেও একেবারে দরিদ্র ছিলেন না। বর্ধমানের মহারাজাধিবাজের অধীনে বাৎসরিক প্রায় দেড় হাজার টাকা আয়ের পত্তনি তালুকের তিনি মালিক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত গ্রামে আমাদের একটি বড় জোত ছিল। তাহাতে যে ধান হইত, তাহাতে আমাদের বাৎসরিক ব্যয় নির্বাহ হইয়াও কিছু কিছু ধান প্রতিবৎসর বিক্রয় কবা চলিত। আখ, পাট, আলু প্রভৃতির চাষও কিছু কিছু হইত। আমাদের সংসারে পিতামাতা বৃদ্ধা পিসিমা আমার একটি খুড়তুতো ভাই এবং একটি সহোদর ছোট ভাই ও ছোট বোন ভিন্ন আর কেহ ছিলেন না। আমাদের নিজ লাঙলে জমি চায হইত। খেতের ধানের চাল, বাড়ির গরুর দুধ, পুকুরের মাছ, বাড়ির বাগানের তরকারি, ইহাতেই আমাদের সুখে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। তৈল, লবণ ও মশলা এবং মাঝে মাঝে সামান্য কিছু মাছ ভিন্ন আর বিশেষ কিছু কিনিতে হইত না। বাড়িতে বারমাসে তের পার্বণ হইত। শুধু আমাদের বাড়িতে নয়, মোটামুটি ভাবে পল্লীর অধিকাংশ গৃহেই এই প্রকার সুখের সংসার পাতা ছিল। শহরের চাকচিক্য তখনও পল্লীবাসীকে এত মুগ্ধ করে নাই! শহরের বিলাসিতা তখন পল্লীগ্রামে এমন ভাবে প্রবেশ করে নাই। বেলা আটটায় নাকে মুখে ভাত গুজিয়া পঁচিশ ত্রিশ টাকা বেতনের লোভে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করিতেও এত লোক তখন ছুটিত না।

কয়েকটি পুত্র কন্যা মৃত এবং গর্ভাবস্থায় নষ্ট হওয়ার পর আমার জন্ম হওয়ায় আমি কিছু বেশি আদরের ছিলাম। বিশেষত পিসিমার নিকট আমার কোন অপরাধই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত না। কোন অন্যায় কাজের জন্য পিতামাতা শাসন করিতে আসিলে, আমি পিসিমার নিরাপদ কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিতাম এবং শাসন করিতে আসিয়া পিতা মাতাই পিসিমা কর্তৃক শাসিত হইতেন। পিসিমা বাবার চেয়ে প্রায় দশ বৎসরের বড় ছিলেন, প্রৌঢ় বয়সেও বাবা কোন দিন পিসিমার মতের বিরুদ্ধে কোন কার্য করিতে সাহসী হইতেন না। সেই পিসিমার নয়নের মণি আমাকে কোন কড়া কথা বলিতে কেহই সাহসী হইত না। সুতরাং আমার আবদার অত্যাচার ও অশিষ্টতা এবং জেদ ক্রমে বাড়িয়াই চলিতেছিল। যাহা করিব বলিয়া সংকল্প করিতাম, ভাল হউক মন্দ হউক কেহই তাহাতে বাধা দিত না। বাল্যকাল হইতেই প্রবৃত্তির উদ্দাম গতিতে বাধা না পাওয়ায়, সেই দুর্বার প্রবৃত্তির স্রোত আমাকে কোথায় টানিয়া আনিয়া ফেলিয়াছে, আজ আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি। পিসিমার অনেক দিন হইল স্বর্গ প্রাপ্তি হইয়াছে কিন্তু প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্রের মস্তকটি ভালভাবে চর্বণ করিয়া, নরকের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রধান পাথেয় উচ্ছৃঙ্খলতা যথেষ্ট

পরিমাণে তাহাকে দান করিয়া, তবে তিনি স্বর্গবাসী হইয়াছেন। আমার পিসিমার মত পিসিমা বাংলার অনেক ঘরেই আছেন এবং যাহারা আমার এই কাহিনি পাঠ করিবেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ পরিবারেও এই প্রকার পিসিমা অথবা অবস্থাভেদে মা, খুড়িমা, ঠাকুরমা, জেঠিমার অস্তিত্ব দেখিতে পাইবেন।

বাল্যকালে গ্রামের গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় আমার বিদ্যারম্ভ হয়। আমার পাঠশালার জীবনে এমন বিশেষ বৈচিত্র্য কিছু নাই যাহা আমার পাঠকগণকে উপহার দিতে পারি। অন্য দশজন ছেলের মত দৌড়াদৌড়ি, হুড়াহুড়ি মারামারি, জলে সাঁতারকাটা, আম বাগানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আম চুরি করা এই সবই করিতাম। অন্যান্য ছেলেরা অভিভাবকের ভয়ে একটু সংযত ভাবে করিত, কিন্তু আমি ছিলাম বেপরোয়া—কারণ আমি জানিতাম সর্বশক্তিময়ী পিসিমা আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিতেছেন। গুরুমহাশয় পাঠশালায় পড়ান ভিন্ন আমার গৃহ-শিক্ষকও ছিলেন এবং বাড়িতে আমাকে কিছু কিছু ইংরেজিও পড়াইতেন। পড়াশুনায় আমি খারাপ ছিলাম না। মেধাবী বলিয়া আমার খ্যাতি ছিল।

তের বৎসর বয়সে আমার পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ হইলে আমাদের গ্রাম হইতে কিছু দূরে শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইনস্টিটিউসন নামক উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে আমি ভর্তি হইলাম। বাড়ি হইতেই বিদ্যালয়ে যাইতে আরম্ভ করিলাম। আমাদের গ্রামের আরও দুই তিনটি ছেলে ওই স্কুলে পড়িত, তাহাদের সঙ্গেই যাইতাম এবং ছুটি হইলে তাহাদেরই সঙ্গে বাড়ি ফিরিতাম। শ্রীরামপুর হুগলি জেলার একটি সাবডিভিসন। সেখানে দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারালয়, হাইস্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, থানা, প্রকাণ্ড বাজার প্রভৃতি সবই আছে। যে দিন আমি প্রথম স্কুলে ভর্তি হই সেদিনের স্মৃতি আমার মনে এখনো বেশ উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত আছে। গুরুমহাশয়ের ভগ্ন প্রায় চণ্ডীমণ্ডপের ছেঁড়া মাদুর হইতে একেবারে প্রাসাদ তুল্য গৃহে টেবিল বোর্ড ডেস্ক প্রভৃতি সুশোভিত কক্ষে পড়িতে আসিয়া বিস্ময় হর্ষ এবং গর্বে আমার মনের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা আমার এখনও বেশ স্মরণ আছে। এ কথাটাও বেশ মনে আছে যে হর্ষ ও বিস্ময় অপেক্ষা গর্বের ভাব বেশি অনুভব করিয়াছিলাম। স্কুল কখন ছুটি হইবে এবং বাড়ি ফিরিয়া মণ্টু, ক্যাবলা, কালু প্রভৃতি আমার দুদিন পূর্বের সহপাঠীদের নিকটে, আমার এই অদ্ভুত সৌভাগ্যের কথা বর্ণনা করিয়া তাহাদিগকে তাক্ লাগাইয়া দিতে পারিব, সেই চিন্তাই সেদিন আমার মনে প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। আমার পিসিমাও নূতন ইংরেজি স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিবার পর যে আমায় বিশেষ আদর যত্ন করিবেন এবং নূতন নূতন খাবারের বন্দোবস্ত করিবেন তাহা বারবার মনে পড়ায় বাড়ি ফিরিবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম।

পাপের পথে

স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর হইতে সর্বপ্রকারেই জীবনে একটা নূতনের আস্বাদ পাইতে লাগিলাম। গ্রামের কপাটি খেলার পরিবর্তে ক্রিকেট ফুটবল প্রভৃতি খেলা, গ্রাম্য পাঠশালার সামান্য কয়েকটি সময়বয়স্ক খেলার সাথীর পরিবর্তে অসংখ্য খেলার সাথী ইত্যাদি নানাপ্রকার পরিবর্তন আমার কিশোর প্রাণে এমন একটা আনন্দের চাঞ্চল্য আনিয়া দিয়াছিল যে স্কুলের সময় ছাড়াও প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি নগরে থাকিতাম। নগ্নপদে একখানা চাদর গায়ে দিয়া গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যাইতাম, এখন সার্ট কোট জুতা পরিয়া স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিয়াছি। বাড়িতে থাকিতে পিসিমার স্বহস্তে প্রস্তুত মুড়ি নারিকেলের সন্দেশ মোয়া ইহাই জলখাবার ব্যবস্থা ছিল, এখন প্রত্যহ পয়সা লইয়া আসি, বাজারের সিঙাড়া, নিমকি, কচুরি, রসগোল্লা টিফিনের সময় কিনিয়া খাই। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে অমৃত মনে করিয়া কি বিষ উদরস্থ্ করিয়াছি। কিন্তু তখন আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবারও কেহ ছিল না। আজ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ মনীষীগণ স্থানে স্থানে সভাসমিতিতে এই বাজারের খাদ্য খাইবার অপকারিতা বুঝাইয়া দিতেছেন এবং সেই মুড়ি নারিকেল খাইতে বলিতেছেন, কিন্তু তখন তাহা কেহ বলিত না।

পিতা আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন, তিনি দোকানের খাবার-খাওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। বাড়িতে বলিয়া দিয়াছিলেন, যেন বাড়িতে প্রস্তুত খাবার আমার সঙ্গে প্রত্যহ দেওয়া হয়। বাবা জানিতেন যে তাঁহার আদেশই প্রতিপালিত হইতেছে, কিন্তু সমপাঠীদিগের বিদ্রূপের ভয়ে আমি কান্নাকাটি করিয়া পিসিমা ও মা'র নিকট হইতে পয়সা আদায় করিয়া লইতাম। কারণ দোকানের খাবার খাওয়াটাই ছেলেমহলে aristocracy বা আভিজাত্যের পরিচায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। মুড়ি নারিকেল চাষার খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

আমার ছাত্রজীবনে যে এক দুষ্টগ্রহের মত আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল তাহার কথাই প্রথমে বলিব। স্বর্গীয় রামময় চৌধুরী কলিকাতার মধ্যে একজন বড় অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে বড় পুত্রটি কলিকাতার কলেজে পড়িত, দ্বিতীয় নারায়ণ মামার বাড়ি থাকিয়া ইউনিয়ন ইন্স্টিটিউসনে উচ্চ শ্রেণিতে পড়িত। ছেলেদের মধ্যে নূতন নূতন ফ্যাশানের আমদানিকারক নারায়ণই ছিল (Introducer of new fashions)। ছেলেমহলে নারায়ণের জামার মত জামা ব্যবহার করা, তাহার অনুকরণে হাতের আস্তিন গুটাইয়া রাখা, তাহার মত চুল ছাঁটা ও টেরি কাটা, ইহাই পরম কাম্য ছিল। নারায়ণ যাহার পোশাক পরিচ্ছদের একটু প্রশংসা অথবা যাহার সহিত একটু হাসিয়া কথা বলিত সে ছেলেকে অন্যান্য সকলেই ঈর্ষার চোখে দেখিত। পল্লীগ্রাম হইতে সদ্য আগত আমার নিকট নারায়ণ Demi God.-এর অর্থাৎ প্রায় দেবতার আসন পাইয়াছিল, অবশ্য দূর হইতেই

তাহাকে আমি এ সম্মান দিতাম ; তাহার সহিত আলাপ করিবার সাহস আমার ছিল না। খেলার মাঠে সে কেমন করিয়া বল করে, কেমন সুন্দরভাবে ব্যাটখানি ধরে, কেমন সব বকুনি দিয়ে কথা বলে, তার কাপড় পরার কায়দাটি বা কেমন সুন্দর, এই সব আলোচনা আমরা আড়ালে আড়ালে করিতাম এবং সাধ্যমত তাহার চালচলন আদবকায়দা, রকম-সকম অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতাম। নারায়ণ আবার নকল করিত তাহার দাদা অনুকূলকে, তিনি কলিকাতা হইতে যখন মাম' বাড়ি আসিতেন, তখন এক এক রকম নূতন ফ্যাশানের আমদানি করিতেন। নারায়ণ সেই ফ্যাশান অনুসারে পোশাক করিত, আমবা সাধ্যমত নারায়ণের অনুকরণ [করার] চেষ্টা করিতাম। আমার পক্ষে এই প্রকার অনুকরণ করা বিশেষ ক্ষতি হইত না, কারণ আমার পিতা একেবারে দরিদ্র ছিলেন না। পিসিমার হাতে বেশ টাকা ছিল এবং আমার আবদার রক্ষা করিতে পিসিমা কোনদিনই কৃপণতা করিতেন না ; কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে এমন অনেক ছেলে ছিল, যাহারা বাড়ি হইতে দরিদ্র পিতার টাকা পয়সা চুরি করিয়া আনিয়া ফ্যাশানের অনলে আহুতি প্রদান করিত।

হঠাৎ আমার অসাধারণ সৌভাগ্য উপস্থিত হইল। একদিন খেলার মাঠে এই নারায়ণের সঙ্গে আমার খুব ভাব হইয়া গেল। সে-ই সাধিয়া আসিয়া আমার সহিত আলাপ করিল। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি ; বাল্যকালে আমার চেহারাটি সুন্দর ছিল। স্বভাবত আমি গৌরবর্ণ ছিলাম, একটু পরিশ্রম করিলেই মুখটি রাঙা হইয়া উঠিত। আমার মুখমণ্ডলের আরও একটু বিশেষত্ব ছিল যে আমি ঈষৎ হাসিলে আমার গাল দু'টিতে টোল্ পড়িত। ছেলেবেলায় আমাকে দেখিয়া—"বাঃ বেশ সুন্দর ছেলেটিতো! তুমি কাদের ছেলে বাবা!" এই প্রকার মন্তব্য অনেক অপরিচিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মুখে আমি শুনিয়াছি। সৌন্দর্যের প্রশংসা শুনিয়া বিশেষ কোন প্রকার মনোভাবের বিকাশ হওয়ার উপযুক্ত বয়স আমার তখন ছিল না। সুতরাং ঐ প্রকার উক্তি আমি শুনিয়া যাইতাম মাত্র কিন্তু তাহাতে মনে কোন দিন দাগ বসে নাই। ক্রমে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্যর প্রশংসা শুনিলে কেমন একটু লজ্জার ভাব ভিন্ন অন্য কোন ভাব পূর্বে কোন দিন মনে আসে নাই। কিন্তু স্কুলে ভর্তি হওয়ার কিছু দিন পর হইতেই নিজের অলক্ষ্যে একটা কেমন নূতন রকমের ভাব আমার মনকে ধীরে ধীরে অধিকার করিতেছিল। উপরের ক্লাসের বড় বড় ছেলেদের সঙ্গে আমাদের ক্লাসের বার তের বৎসর ছেলেদের মধ্যে যাহারা দেখিতে একটু সুন্দর, তাহাদের একটা লুকাইয়া দেখাশুনা, লুকাইয়া কথা বলা, অর্থাৎ এমন একটা আদান প্রদান চলিতেছে যাহা তাহারা প্রকাশ করিতে সাহসী বা ইচ্ছুক নহে। নূতন আবেষ্টনের মধ্যে আসিয়াই হউক অথবা পাড়াগাঁয়ের আমদানী বলিয়াই হউক—উপরের ক্লাসের কোন ছেলে আমার সঙ্গে কথা বলিতে আসিলে আমি সঙ্কোচ বোধ করিয়া সরিয়া যাইতাম ; কিন্তু উপরের ক্লাসের বড় বড় ছেলে অনেকেই যে আমার সঙ্গে আলাপ করিতে ইচ্ছুক ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম।

একদিন খেলার মাঠে যখন সকলে খেলিতেছিল তখন আমি একধারে বসিয়া লাল

নীল কাগজ কাটিয়া লতা ও ফুল তৈয়ারি করিতেছিলাম। পরদিন স্কুলে ইন্‌স্পেকটার আসিবেন, সেইজন্য স্কুলগৃহ সজ্জিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছিল। এই সকল কাজ জানিতাম বলিয়া আমার ও আর কয়েকটি ছেলের উপর মাস্টার মহাশয় এই ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। নাবায়ণ ও তাহার ক্লাসের একটি ছেলে দূরে দাঁড়াইয়া কি যেন বলিতেছিল। তাহারা কথা বলিতে বলিতে দুই চার বার আমার দিকে ফিরিয়া তাকাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে নারায়ণ আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং একটি কাগজের ফুল হাতে লইয়া বলিল,—"বাঃ সুন্দর ফুলটিতো, এটা তুমি করেছ?" আমি মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলাম যে ফুলটি আমিই প্রস্তুত করিয়াছি। নারায়ণ তখন আমার বাড়ি কোথায়, কোন ক্লাসে পড়ি, বাড়িতে আমার আর কে কে আছে এই সব নানা প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল, আমিও সেগুলির উত্তর দিলাম। তাহাদের সঙ্গে আমি কথা বলিতেছিলাম এদিকে কাজও করিতেছিলাম। তাহার পব নারায়ণ আমার মত করিয়া ফুল তৈয়ারি করিতে লাগিল, কিন্তু পারিল না। তাহার ফুল দেখিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম, সেও সেই হাসিতে যোগ দিল, তারপর বলিল,--

—"তুমি আমাকে এই রকম ফুল আর লতা কত্তে শেখাবে?"

আমি বলিলাম—"বেশ তো—আপনি দু'চার বার দেখলেই করতে পারবেন।"

এমন সময় তাহাকে কে ডাকিল, সে চলিয়া গেল। সেদিন আমার মনে যে আনন্দ হইয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। যে ছেলের সঙ্গে একটা কথা বলিতে পারিলে ছেলেরা কৃতার্থ হয়, সেই নারায়ণ যাচিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিয়াছে, আমার নিকট ফুল প্রস্তুতের কৌশল শিখিতে চাহিয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর গর্বের বিষয় কী হইতে পারে?

সেই দিনের আলাপ ক্রমশ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল। মধ্যে মধ্যে স্কুলের ছুটির পর নারায়ণ আমাকে বাড়িতে আগাইয়া দিয়া যাইত। সে নানা প্রকার গল্প করিত, তাহার বাবার নিকট সে কলিকাতায় কতবার গিয়াছে, কলিকাতায় কত সব আশ্চর্য জিনিস দেখিয়াছে এই সব গল্প করিত। রেশমি রুমাল, অটোমেটিক পেন্‌সিল, শিশি ভরা এসেন্স এই প্রকারের জিনিস মাঝে মাঝে আমাকে উপহার দিত। আমি তাহাকে ডাকিতাম "নারায়ণ-দা" সে আমাকে ডাকিত "রমা"।

পিশাচরূপী নারায়ণ আমার মনের অজ্ঞাতে যে সূত্র ধরিয়া আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া আমাকে জাহান্নামে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিল তাহা মনে হইলে এখনও দুঃখ হয়। কত কিশোর বালক যে এই প্রকার বন্ধুত্বের ফলে পাপ-সাগরে ডুবিতেছে তাহার সংখ্যা কে বলিবে।

একদিন ছুটির পর নারায়ণ-দা আমাকে তাহাদের বাগানে লইয়া গেল। তাহার পিতা বাগানটি বেশ সাজাইয়াছিলেন। একদিকে একটা লতায় ঢাকা কুঞ্জবনের মধ্যে শ্বেত পাথরের বসিবার বেঞ্চ ছিল। চার পয়সার চানাচুর ঘুগনিদানা কিনিয়া লইয়া আমরা দু'জনে

সেই কুঞ্জের মধ্যে বসিলাম। সে দিন আকাশটা মেঘলা ছিল। আমরা পাশাপাশি বসিয়া আছি এমন অবস্থায় নারাণ-দা হঠাৎ আমাকে একেবারে বাম হাতে টানিয়া তাহার কোলে আমার মাথা রাখিয়া মুখে চানাচুর গুঁজিয়া দিয়া বলিল—

"আমি তোকে খাইয়ে দি—তুই আমাকে খাইয়ে দে"

আমি হাসিতে লাগিলাম এবং তাহার হাত হইতে চানাচুর খাইতে লাগিলাম ও তাহাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলাম। হঠাৎ নারাণ-দা বলিল—"তুই তো রমা—কেমন"?

আমি বলিলাম—"হ্যাঁ তাই তো কেন!"

নারাণ-দা বলিল—"রমা মানে কি তা জানিস?"

আমি বলিলাম—"হ্যাঁ তা জানি বই কি!"

নারাণ-দা বলিল—"আমি নারায়ণ—রমা নারায়ণের কি হয় জানিস?"

আমি বলিলাম—"জানি।"

নারাণ-দা বলিল—"তবে?"

আমি কেমন যেন অবাক হইয়া গেলাম, তারপর তাড়াতাড়ি আমাকে ধরিয়া নারাণ-দা আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল—

"রাগ কল্লি ভাই?"

প্রকৃত পক্ষে আমি রাগ করি নাই—রাগ কেন কিছুই করি নাই বলিলেই ঠিক হয়। তাহার কথায় প্রথমত আমার প্রাণে একটা বিস্ময়ের ভাব জাগাইয়া দিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা অনুভূতির সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহার তখন কোন নাম দিতে পারি নাই। নারাণ-দা ওই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে পকেট হইতে একখানা অদ্ভুত রকমের ছুরি বাহির করিল, তাহার মধ্যে ছুরি, কাঁচি, কাঁটা আরও কতকী ছিল। সেইটা আমাকে দিয়া বলিল—

"নে ভাই এটা তোর জন্যে এনেছি।"

এ রকম ছুরি আমি পূর্বে কোন দিন দেখি নাই, ওই অপূর্ব জিনিসটি আমার হইল—এই আনন্দে আমার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

প্রথমেই বলিয়াছি আমি কোন কথা গোপন করিব না। পিতা মাতা পুত্রকে শিক্ষিত সৎচরিত্র দেখিবেন আশা করিয়া স্কুলে শিক্ষকগণের নিকট প্রেরণ করেন ; কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে তাঁহাদের পুত্রগণ লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কি বীভৎস শিক্ষা আয়ত্ত করিতে থাকে। আমার পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা আমার বয়স প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা নিজ নিজ স্কুলের জীবন স্মরণ করিয়া দেখুন, বোধ হয় অনেকের জীবনেই আমার ছাত্র-জীবনের ন্যায় বহু অভিজ্ঞতা লাভের কথা মনে পড়িবে। আমার মত খোলাখুলি ভাবে একথা অনেকেই হয়ত স্বীকার করিবেন না ; কিন্তু মনে মনে আমার কথার সত্যতা অনেকেই স্বীকার করিবেন, একথা স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি।

ইহার পূর্বে—আমার যতদূর মনে হয়—এই সর্বনাশের আকাঙ্ক্ষার অনুভূতি আমার একেবারেই ছিল না।

আজকাল কোন কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাই মাতৃ-ক্রোড়েও শিশুর যৌন আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হয়, ইহাই তাঁহারা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত। কিন্তু আমার নিজের অভিজ্ঞতা যতটুকু তাহাতে বলিতে পারি, নারাণ-দাব সহিত বন্ধুত্ব স্থাপিত হওয়ার প্রায় এক বৎসর পরে বোধ হয় প্রকৃত আকাঙ্ক্ষার অনুভূতি আমার জাগিয়াছিল। আকাঙ্ক্ষার অস্পষ্ট জাগরণ, যাহার কথা প্রথমেই বলিয়াছি, তাহার অনুভূতি মাঝে মাঝে হইলেও তাহার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এবং তাহা চরিতার্থদ্বারা কী প্রকার সুখলাভ হয় তৎসম্বন্ধে জ্ঞান আমার তখনও হয় নাই। সুতরাং ওই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার প্রবল ইচ্ছাও তৎকালে আমার প্রাণে জাগরিত হয় নাই। পূর্বোক্ত ঘটনার এক বৎসর অথবা দেড় বৎসর মধ্যেই আমি সেই সর্বনাশের কু-অভ্যাসে,—যাহার অনুষ্ঠান করিয়া বাংলার কিশোরগণ অকাল বার্ধক্য এবং মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া আনিতেছে তাহাও শিক্ষা করিলাম। আমার সর্বনাশের ইহাই প্রথম সোপান।

নারাণদার সহিত বন্ধুত্ব করিবার পর আমি ক্রমে ক্রমে অনেক ব্যাপারই জানিতে পারিয়াছিলাম। সমুদয় স্কুলটি জুড়িয়া এই প্রকার ঘৃণিত অভিনয় গুপ্তভাবে চলিতেছিল। শতকরা দশটা ছেলেও নির্দোষ ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। কোন্ ছেলের সঙ্গে কাহার ভাব, কাহার কতজনের সঙ্গে ভাব, এ সমস্ত সংবাদ নারাণ-দা বিশেষ ভাবে রাখিত। এমন কি আমাদের স্কুলের জনৈক শিক্ষকও এই ঘৃণিত কার্যে ব্রতী ছিলেন। নারাণদার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার পর আমি শুনিয়াছিলাম যে একজনের পেয়ারের ছেলেকে ফুশলাইয়া লইতে আর একজন চেষ্টা করিত, গোপনে প্রেমপত্র লেখা হইত। দূতীগিরি করিবার জন্যও এক শ্রেণির ছেলে নিযুক্ত ছিল।

আমার জীবনের এই অঙ্কে আমি এখানেই যবনিকা ফেলিতে চাই। আমার বিশ্বাস এখনও স্কুলের ছাত্র মহলে এই প্রকার সর্বনাশকর কু-অভ্যাস চলিতেছে। স্কুলের শিক্ষক, পিতা মাতা অভিভাবকগণ অনেকেই বুঝিতে পারেন না যে এই পাপ কোন্ সূত্র ধরিয়া তাঁহাদের স্নেহের পুতুলিগুলিকে গ্রাস করে। নানা প্রকার সংস্কারের চেষ্টায় আজ নব্য বঙ্গ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। এই গোড়ায় গলদ নিবারণ করিবার জন্য সংস্কারকগণ একটা উপায় নির্ধারণ করিতে পারিলে, আমার এই নির্লজ্জ বিবৃতি সার্থক হইবে বলিয়া মনে করিব।

প্রতিবেশী কিংবা স্কুলের ছাত্র কোন ছেলেকে অযাচিত ভালবাসা দেখাইলে বা কোন প্রকার স্নেহোপহার দিলে তাহার মূলে যে কোন স্বার্থ আছে একথা কোন অভিভাবক হয়ত ভাবিতেও পারেন না। কিন্তু এই প্রকার ভালাবাসার যে কি শোচনীয় পরিণাম ঘটিতে পারে তাহা অভিভাবকদিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্যই এত খুঁটিনাটি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

পাপের ক্রমবিকাশ

মেধাবী ছাত্র বলিয়া সকলেই আমার প্রশংসা করিত। পূর্বোল্লিখিত দুষ্কার্যে মত্ত হইলেও আমি পড়াশুনায় অমনযোগী হই নাই। প্রতি বৎসর ক্লাসে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বারবার প্রমোশন পাইয়াছি। প্রতি বৎসর পুরস্কারের বই লইয়া যখন বাড়িতে আসিতাম তখন বাবা মা পিসিমা সকলেই খুব আনন্দিত হইতেন। বাবা ভারি চাপা লোক ছিলেন, তাঁহার সুখ দুঃখ লোকে সহজে বুঝিতে পারিত না। কিন্তু আমার বিলাসিতা যখন ক্রমে বাড়িয়াই চলিতে লাগিল, নিত্য নূতন জামা কাপড় জুতা প্রভৃতির বায়না যখন পিসিমার ক্ষুদ্র পুঁজি হইতে পূরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন পিসিমা বাবাকে বলিয়া আমার সেই আবদার পূরণ করিতেন। বাবাও বিশেষ আপত্তি না করিয়া সকল দ্রব্যের জন্য পিসিমাকে টাকা দিতেন। তাহা হইতেই বুঝিতে পারিতাম যে আমার পড়াশুনার উন্নতিতে বাবা সন্তুষ্ট ছিলেন। বাবা কোন সময় সামান্য আপত্তি করিলে—এই প্রকার বিলাসিতার প্রশ্রয় দিলে আমি পরিণামে খারাপ হইয়া যাইব—এই প্রকার কোন কথা বলিলে, পিসিমা গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিতেন,—কেলাসে (Classএ) বছর বছর পেরাইজ (Prize) পাচ্ছে তবু তুমি বলছ ছেলে খারাপ হয়ে যাবে। রমার মত ক'টা ছেলে পাড়ায় আছে? আর দশজন ছেলে ভাল কাপড় জামা পরে বেড়াবে, আর বাছা আমার মুখ নিচু করে থাকবে, তা হবে না! পাঁচটা নয় দশটা নয়, একটা ছেলে [অথচ প্রথমেই বিবৃত হয়েছে তার একটি সহোদর ছোট ভাই আছে। পৃঃ ১২১]—সে একটু ভাল খাবে ভাল পরবে তাও তোমার সয় না!"—

এই প্রকার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়াই হউক অথবা আমি পড়াশুনা ভালভাবে চালাইতেছি বলিয়াই আমার আবদার পালন করা উচিত, এই মনে করিয়াই হউক, বাবা টাকা দিতে বিশেষ আপত্তি করিতেন না। সুতরাং আমার বিলাসিতা বাড়িয়াই চলিতেছিল। নিত্য নূতন ফ্যাশানের জামা জুতা পমেটম এসেন্স প্রভৃতির খরচ, নিজের খাবারের খরচ—বন্ধুবান্ধবদিগকে খাওয়াইবার খরচ—ইহাতে মাসে নেহাৎ কম লাগিত না।

আমার স্কুলে ভর্তি হওয়ার দুইবৎসর পর নারাণ-দা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল কিন্তু সে বৎসর পাশ করিতে পারে নাই। তাহার পর বৎসর সে পরীক্ষা পাশ করে। সুতরাং তিন বৎসর আমরা একত্রে থাকিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। এই তিন বৎসর নারাণ-দা আমাকে আর একটি বিদ্যায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন, সেটি হইতেছে সিগারেট খাওয়া ; অবশ্য অত্যন্ত গোপনে ইহা খাওয়া হইত। 'কৃপণের ধন' প্রহসনে সুরসিক অমৃতলাল মধু-খুড়ার মুখে বলাইয়াছেন—

—'পাঠশালায় তামাক, স্কুলে সিগারেট, কলেজে হুইস্কি, বিষয় কর্মে গাঁজা, শেষে চণ্ডু টেনে সমাধিতে যেয়ে বসো।"—

আমার ভাগ্যে পাঠশালায় তামাকটা হয় নাই বটে, কিন্তু অবশিষ্টগুলি হুবহু খাটিয়া গিয়াছে। তামাকটাও বাদ যায় নাই, তবে সেটা আরম্ভ হয় অনেক পরে। সে সব ইতিহাস যথাস্থানে বলিব।

নারাণ-দার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছিল তাহার কিছুদিন পর আমি নিজেই যখন লায়েক হইয়া উঠিলাম তখন অবশ্য সেই সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্বের বন্ধন ক্রমেই দৃঢ়তর হইতেছিল এবং পরস্পরের মনের কথার আদান প্রদান হইত। এই ভাবের আদান প্রদানের ফলে একদিন নারাণ-দার নিকট এমন একটা সংবাদ পাইলাম যাহাকে আমার ভবিষ্যৎ আরও গভীর অধঃপতনের বিশেষ কারণ বলিয়া এখন মনে করিতে পারি। বাড়িতে যুবতী ঝি থাকিলে যে কি ভীষণ পরিণাম ঘটিতে পারে তাহা অনেক অভিভাবক প্রথমত বুঝিতে পারেন না। এই প্রকার সুযোগ পাইয়া নারাণ-দা নিজে সর্বনাশের পথে আর এক ধাপ নামিল এবং আমাকেও আগাইয়া দিল।

কোন কারণে আমি তিন চারিদিন স্কুলে যাই নাই। তিন চারিদিন পরে স্কুলে টিফিনের ছুটির সময় নারাণ-দার সঙ্গে মিলিত হইলাম এবং প্রথম প্রশ্নই নারাণ-দাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি নারাণ-দা তোমার নলিনের খবর কি?"

নারাণদা বলিল—"নলিন ফলিনের চেয়ে অনেক উঁচু দরের জিনিস শর্ম্মারাম এবার দখল করে বসেছেন!"

আমি একটু অবাক হইলাম, তারপর চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কে নারায়ণ-দা? কোন্ ক্লাসে?" নারাণ-দা আবার হাসিয়া উঠিল—তারপর বলিল—

"কেলাস ফেলাস নয় রে গরু, কেলাস ফেলাস নয়।"

আমি নির্বাক বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম, সে আমার মুখের ভাব দেখিয়া খুব এক চোট হাসিয়া লইল—তারপর বলিল—"শোন্ তোকে সব কথা বল্‌ছি। আমাদের বাড়ির রানি ঝিকে চিনিস তো, সেই যে আমাদের খাবার টাবার এনে দেয়!"

নারাণ-দা আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল—সেই।

আমি প্রায় লাফাইয়া উঠিলাম। তারপর নারাণ-দার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলাম—"সত্যি বল্‌ছো?"

নারণা-দা বলিল—"সত্যি নয়তো কি মিছে!"

আমি তখন নারাণদাকে ধরিয়া বসিলাম কেমন করিয়া কী ভাবে এই ব্যাপার সংঘটিত হইল তাহার বিস্তারিত ইতিহাস শুনিবার জন্য। তাহার উত্তরে নারাণ-দা যাহা বলিল তাহাতে আমি জানিতে পরিলাম যে ৪/৫ দিন পূর্বে আমাদের স্কুলের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী একটি স্কুলের একটা ফুটবল ম্যাচ খেলিতে নারাণ-দা হাতে একটা চোট পাইয়াছিল। তখন বিশেষ কিছু লাগে নাই কিন্তু বাড়িতে গেলে সন্ধ্যার পর হইতে ক্রমে বেদনা বৃদ্ধি হয়। নারাণ-দার মা রানিকে বলেন তাহার হাতে একটা ঔষধ মালিশ করিয়া দিতে।

নারাণ-দা বিছানায় শুইয়াছিল, রাণী বিছানায় বসিয়া তাহার হাত দুটি কোলের কাছে

লইয়া ঔষধ মালিশ করিতেছিল। ঔষধ মালিশ করিবার সময় নারাণ-দা একবার নড়া-চড়া করিতে তাহার একটা হাত হঠাৎ রানির অঙ্গ স্পর্শ করে। বলা বাহুল্য নারাণ-দা ইচ্ছা অথবা কোন উদ্দেশ্য লইয়া ওই প্রকার করে নাই। সে নারাণ-দার দিকে একটা বিলোল কটাক্ষ হানিয়া বলিল—'ছিঃ দাদাবাবু!' নারাণ-দা প্রথমত একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়াছিল কিন্তু পরক্ষণই তাহার কিছু বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

নারাণ-দার নিকট এই কাহিনি (অবশ্য এত সংক্ষেপে নয়) খুটিনাটি প্রত্যেক বিষয় সহ শুনিবার পর নারাণ-দার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে আমার মন ভরিয়া উঠিল। নারায়ণ-দার প্রতি "শ্রদ্ধা" ও "সম্ভ্রম" এই দুইটি কথা শুনিয়া কেহ হাসিবেন না। বাস্তবিক তখন আমার মনে যে ভাব জাগিয়াছিল, এতদিন পরে তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে তাহা "শ্রদ্ধা" ও "সম্ভ্রম" ভিন্ন আর কিছুই নহে। তখন কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিস্থলে আমরা দাঁড়াইয়া। নানা উপায়ে সর্বনাশী ক্ষুধার নিবৃত্ত করিলেও বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে যাহা করিতেছি তাহা শুধু "ছায়া" লইয়া খেলা, প্রকৃত "কায়ার" নকল, আসল কায়া নহে। সেই রহস্যের অবগুণ্ঠন উপযুক্ত সাহসের অভাবে আমরা তখন পর্যন্ত কেহই মোচন করিতে পারি নাই। কেবল মাত্র কল্পনার সাহায্যে সেই পাপের মাধুর্য নানাপ্রকার রঙিন রেখায় অঙ্কিত করিতেছি মাত্র। এই প্রকার অবস্থায় যখন জানিতে পরিলাম যে আমাদেরই একজন সেই সর্বনাশী রহস্যের অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়াছে, যাহা আমাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ ফল, সাহসের সহিত তাহা চয়ন করিয়া উপভোগ করিয়াছে, (Has plucked and enjoyed the forbidden fruit) তখন তাহার প্রতি আমাদের মনে "শ্রদ্ধা" ও "সম্ভ্রমের" জাগরণ ভিন্ন অন্য আর কি ভাব আসিতে পারে! ফুটবলে, ক্রিকেটে, ফ্যাশানে সবটাতেই নারাণ-দা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া যেমন আমার শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে, এই ব্যাপারেও তাহার এই কৃতিত্ব (achivement) আমার প্রাণে ঠিক সেই জাতীয় শ্রদ্ধারই উদ্রেক হইয়াছিল।

ইহার পর প্রায় প্রত্যহই নারাণ-দার সঙ্গে আলাপ হইতে লাগিল। কি কি উপহার নারাণ-দা তাহাকে দিয়াছে (অবশ্য কলের লাটিম, আর অটোমেটিক পেনসিল নয়) ইত্যাদি সব কথা শুনিতাম এবং এই প্রকার সৌভাগ্য আমার কবে হইবে তাহা চিন্তা করিতাম। এক দিন যাহাকে সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতাম আজ বুঝিতেছি তাহা সৌভাগ্য নহে, দুর্ভাগ্যেরই প্রথম সোপান মাত্র। প্রকাশ্যে পতিতালয়ে যাওয়ার প্রবৃত্তি আমার ছিল না, সে সময়ে কেমন একটা ঘৃণাও ছিল, সাহসও ছিল না বলিতে পারি। দুর্ভাগ্যক্রমে বাড়িতে যে ঝি ছিল তাহার বয়স পঁচিশ ত্রিশ হইলেও রং ছিল আবলুস কাঠের মত। সম্মুখের দুটি দাঁত ঠোঁটের বাহিরে সর্বদা যেন আক্রমণোদ্যত হইয়া থাকিত। সুতরাং তাহাকে অবলম্বন করিয়া কোন প্রকার রোমান্‌স্ (Romance) সৃষ্টি করাও সম্ভব ছিল না। অতি আধুনিক নব্য সাহিত্যের প্রচার হইয়া পদি জেলেনি, ভবি মেছুনি প্রভৃতি বস্তিবাসীগণকে তখনও নায়িকার পদবিতে প্রতিষ্ঠিত করে নাই : সুতরাং আমার আশা পূর্ণ হওয়ার কোন প্রকার সুযোগ খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না।

কিন্তু "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদশী" এই কথাটির সার্থকতা শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম। অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার সুযোগ ঘটিয়া গেল। সেদিন রবিবার। আহারের পর একটু বিশ্রাম করিয়া বেলা প্রায় দুইটার সময় ছিপ চার প্রভৃতি লইয়া আমাদের চাটুজ্জেদের পুকুরে মাছ ধরিতে গিয়াছি। চাটুজ্জ্যেদের প্রকাণ্ড চকমেলান বাড়ির সম্মুখে এই পুকুর। চাটুজ্জ্যেদের কেহই থাকেন না। কর্তা চাকুরি উপলক্ষে সারা বৎসর বাংলা দেশের নানা জেলায় ঘুরিয়া বেড়ান। পরিবারবর্গ তাহার সঙ্গেই থাকেন। বাড়ির অন্তঃপুরে বৃদ্ধা মাতা থাকেন। অধিকাংশ ঘরই তালা দ্বারা আবদ্ধ থাকে। বাড়ির বৈঠকখানা সোফা কাউচ প্রভৃতি দ্বারা আধুনিক প্রথামত সজ্জিত। আর একটিতে তাকিয়া সতরঞ্চ প্রভৃতি বিছাইয়া প্রাচীনমতে ফরাস করা থাকে, আর একটি কক্ষে সম্ভ্রান্ত অতিথি প্রভৃতি থাকিবার জন্য দু'খানি খাট পাতা আছে। এই বৈঠকখানা ঘরের প্রথোমক্ত এবং শেষোক্ত কক্ষও তালা-বন্ধ থাকে। কেবল মাত্র ফরাস করা ঘরটা খোলা থাকে। এই ঘরে বাবুর ভাগিনেয় শ্রীমান অপূর্ব সশরীরে বিরাজ করিয়া থাকেন। এই শ্রীমানের বয়স তখন সাতাশ-আটাশ বছর, পিতামাতা নাই, মাতুলের অন্নেই প্রতিপালিত। মাতুল লেখাপড়া শিখাইতে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু এণ্ট্রান্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণিতে পাঁচবার প্রমোশন না পাওয়ায় বিদ্যা সেইখানেই খতম হয়। কিন্তু বিদ্যা তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত হইলে কি হইবে, তাহার মুখে ইংরেজি বুকনি দেওয়া বক্তৃতা শুনিলে মনে হইত যে সে অন্তত বি. এ. পর্যন্ত পড়িয়াছে। সম্মুখে চোদ্দ আনা, পিছনে দু'আনা রকমে ছাঁটা চুল, মিহি আদ্দির আজানুলম্বিত পাঞ্জাবী, লম্বা কোঁচা ঘুরাইয়া পাঞ্জাবীর পকেটে গোঁজা, মুখে প্রজ্বলিত সিগারেট, হাতে একখানি ছড়ি, পায়ে নাগরাই লপেটা জুতা (তখন তাহা কেবল নূতন উঠিয়াছে), এই বেশে আমরা তাহাকে প্রায়ই দেখিতে পাইতাম। গ্রামের শখের থিয়েটারে তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী। হারমোনিয়াম বাজাইতে, মেয়েলি গলায় গান গাহিতে তিনি খুব পটু। সম্প্রতি কলিকাতা যাইয়া নৃপেন বোসের নিকট নাচ শিখিয়া আসিয়াছেন এবং গ্রামের ও আশ-পাশের কতকগুলি ছেলেকে লইয়া নাচ শিখাইতে ব্যস্ত আছেন। তখনকার দিনে তিনি ছিলেন 'অতি আধুনিক' বেকার গ্রাম্য বাবু এবং তিনি নিজকে রবিবাবুর শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেন। বাবুর মাতা তাঁহার মাতামহী, আমার পিসিমারই উন্নত সংস্করণ ছিলেন। সুতরাং দাদার এই বাবুয়ানায় বিশেষ বাধা হইত না। বৎসরে এগার মাস অব্যাহত স্বাধীনতা তিনি ভোগ করিতেন, কেবল যে একমাস বাবু বাড়িতে থাকিতেন সেই একমাস তাঁহার স্বাধীনতা কিছু খর্ব হইত। যাহা হউক যে কথা বলিতেছিলাম তাহাই এখন বলি। আমি মাছ ধরিতে যখন পুকুরের ঘাটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম তখন ঘাটে কোন লোকজন ছিল না। ঐ দিকটাই স্বভাবত নির্জন। চাটুজ্জেদের বাড়িতেও সেই সময় লোকজন শূন্য।

আমি ধীরে ধীরে ঘাটে নামিলাম সহসা ঘাটের সকলের নীচের ধাপে আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। দেখিলাম একটা কলসি এবং একখানা চওড়া লালপেড়ে শাড়ি ও গামছা

সেই ধাপের উপর এক পাশে রহিয়াছে কিন্তু কোন লোক নাই। আমার মনে গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হইল। আমি জানিতাম চাটুজ্জেদের বাড়িতে কোন সধবা মেয়ে নাই। সুতরাং এই শাড়ি পাড়ার অন্য কোন মেয়ের হইবে তাহা বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু সে মেয়ে কোথায় গেল! আমার ধারণা হইল কোন মেয়ে হয়ত পা পিছলাইয়া পরিয়া ডুবিয়া গিয়াছে। আমি ছিপ ফেলিয়া তাড়তাড়ি জলে নামিয়া অনুসন্ধান করিতে উদ্যত হইলাম, কিন্তু হঠাৎ মনে হইল যে চাটুজ্জে বাড়িতে যদি কোন আত্মীয় কুটুম্বের মেয়ে আসিয়া থাকে তবে সে হয়তো ঘাটে এই সব রাখিয়া অন্য কোনও কিছু আনিতে বাড়ির ভিতরে যাইয়া থাকিবে। এই কথা মনে হইতেই জলে আর নামিলাম না, দুই তিন মিনিট কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম। তারপর মনে হইল দাদা বোধ হয় বৈঠকখানা ঘরেই আছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেই গোল মিটিয়া যায়। এই মনে করিয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিলাম এবং দৌড়িয়া বৈঠকখানা ঘরে দরজায় গেলাম। দুটি কক্ষ বাহির হইতে তালা বন্ধ ছিল। মধ্যের কক্ষের দরজা ভেজান ছিল, আমি ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলিয়া গেল এবং ভিতরের হুড়কাটা সশব্দে মেজের উপর পরিয়া গেল। বুঝিতে পারিলাম হুড়কাটা ভাল করিয়া লাগিয়াছিল না। যাহা হউক দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে যে দৃশ্য আমার চোখে পরিল তাহাতে আমি হতভম্ব হইয়া গেলাম।

আমি সমুদয় ব্যাপারই বুঝিতে পারিলাম। ঘাটে যে কলসি ও কাপড় ছিল তাহা যে রমলার এবং রমলাই পুকুরে গা ধুইবার ও জল আনিবার ছল করিয়া অপূর্বদার নিকট আসিবার সুযোগ করিয়া লইয়াছে তাহা আমার বুঝিতে বাকি রহিল না। আমি কিছু না বলিয়া ফিরিয়া আসিলাম এবং ঘাটে আসিয়া চার করিয়া ছিপ ফেলিবার যোগাড় করিতে লাগিলাম।

যোগাড় করিত লাগিলাম বটে কিন্তু আমার সে সময়ের মনের অবস্থা অতি আধুনিক কোন কবির ভাষায় বলিতে গেলে—

"দেহে দাহ চোখে মরু সর্ব অঙ্গ কাঁপিছে তৃষায়"। অল্পক্ষণ পূর্বে ষোড়শী সুন্দরী রমলার যে মূর্তি আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহার স্মৃতি শিরায় শিরায় যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটাইয়া দিতেছিল। ছিপটা ধরিয়া বসিয়াছিলাম বটে কিন্তু মাছ ধরিবার দিকে আমার কোন লক্ষ ছিল না। ভাবিতেছিলাম রমলার কথা, আর ভাবিতেছিলাম তাহার নিটোল নিখুঁত অবয়ব ইত্যাদি—। সহসা আমার চিন্তাস্রোতে বাধা পরিল, আমার পা দুটিতে কাহার হস্ত এবং তপ্ত কয়েক ফোটা জলের স্পর্শ অনুভব করিলাম। আমি চমকিয়া উঠিয়া দেখি রমলা দুই হাত দিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতেছে। অতি কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিলাম—

—"কিরে রমলি কাঁদিস্ কেন?"

রমলা বলিল—"দোহাই তোমার রমেশ-দা।"

এই কথা বলিয়া আরও জোরে ফোপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি গম্ভীরভাবে

বলিলাম—"তুই একেবারে বয়ে গেছিস্—বাড়ুজ্জে কাকাদের আমায় এসব বলতেই হবে। ছি। ছি! তুই যে বাড়ুজ্জে গোষ্ঠীর নাম ডোবালি।"

রমলা আরও কাঁদিতে লাগিল, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া এবং আমার দু'টি হাত তাহার দুই হাত দিয়া ধরিয়া বলিল,—"আমি তা হলে আর বাঁচবো না রমেশ-দা, বাবা শুনলে আমায় মেরে ফেলবে। দোহাই তোমার—আমাকে মাফ কর।"

আমি বলিলাম—"আচ্ছা বেশ--কিন্তু তার জন্য তুই কি দিবি?"

রমলা বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"কী দেবো রমেশ-দা! আমার কী আছে--কি চাও তুমি!"

আমার বুকের ভিতর টগ বগ করিয়া রক্ত ফুটিতেছিল।

রমলা আমার মুখের দিকে তাকাইয়া একবার বিদ্রূপের হাসি হাসিল, তারপর বলিল—"বটে, তবে না বড় নেকচার (lecture) দিচ্ছিলে!"

আজ এই দীর্ঘকাল পরে, যৌবনের উন্মাদনা যখন হ্রাস হইয়াছে, অপরিমিত অত্যাচারের ফলে নানাপ্রকার ব্যাধি যখন আসিয়া দেহকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, অজ্ঞাত অজানা-রাজ্যে কৃতকার্যের ফলাফল ভোগ করিবার জন্য, অলভনীয় আহ্বানের দূরাগত অস্পষ্ট ধ্বনি যখন এক একবার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে তখন বুঝিতে পারিতেছি যে নিজের কী সর্বনাশ আমি করিয়াছি। কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কি আমি? আমার মনে হয় কতকটা আমি হইলেও সম্পূর্ণ আমি নই। ধর্ম ও সংযমহীন শিক্ষা প্রণালী, যাহা শুধু বিলাসিতার আগ্রহ বৃদ্ধি করে, তাহাই আমার অধঃপতনের জন্য প্রধানত দায়ী বলিয়া আমার মনে হয়। আমার দুষ্টগ্রহ নারাণ-দা এই প্রকার শিক্ষা প্রণালীরই একটি জীবন্ত ফল। তিনি আমার সর্বনাশ করিয়াছিলেন, আরও অনেকের সর্বনাশ করিয়াছেন, আমি এবং সেই সকল ছেলে আবার আরও অনেকের সর্বনাশ করিয়াছি, তাহারাও তাহাদের পরবর্তী অনেকের সর্বনাশ করিয়াছে। এই পাপের ক্ষুদ্র বীজ শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট বিশাল মহীরুহের আকার ধারণ করিয়া আমাদের সমাজকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সেই বৃক্ষের আওতায় প্রকৃত মনুষ্যত্বের বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারিতেছে না।

প্রাচীনকালে গুরুগৃহে শান্ত সমাহিত চিত্তে ধর্ম ও নীতির অবেষ্টনে সংযম ও ব্রহ্মচর্যের ভিতর দিয়া যে শিক্ষা ছাত্রগণ লাভ করিত, বর্তমান যুগে তাহা ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করা দুরাশা মাত্র—তাহা অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু বর্তমান যুগোপযোগী শিক্ষার মধ্যেও সেই ব্রহ্মচর্য, সংযম, ধর্ম ও নীতির আবহাওয়া সৃষ্টি করা কি একেবারেই অসম্ভব! আমার চরিত্রের যে পরিচয় এপর্যন্ত পাঠকগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে আমার মুখে এই সব কথা তাঁহারা "ভূতের মুখে রাম নাম" মনে করিতে পারেন। কিন্তু আমি ঠেকিয়া শিখিয়াছি—যাঁহারা এই সব চিন্তা করেন তাঁহারা অন্তত আমার এই কঠোর অভিজ্ঞতার সুযোগ লইতে ঘৃণা করিবেন না আশায় এই কয়েকটি কথা বলিলাম। এই অতি আধুনিক বাবুটির সংশ্রবে আমার মত কত কিশোর ও যুবক যে বিপথগামী হইয়াছে তাহা ভাবিলে এখনও শিহরিয়া

উঠিতে হয়। এই প্রকার বাবুর আওতা হইতে ছেলেদিগকে দূরে রাখিতে অভিভাবকদিগকে সাবধান করিবার জন্যই নিজ জীবনের এই ঘৃণ্য কাহিনিও লিখিতে বাধ্য হইলাম।

আমার যে খুড়তুতো ভাইয়ের কথা বলিয়াছি তিনি আমার ন্যায় শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। কৈকালা ও নবদ্বীপ সংস্কৃত টোলে তিনি কাব্য ব্যাকরণ সাংখ্য বেদান্ত ও স্মৃতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কৈকালা গ্রাম সংস্কৃত শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। অনেকগুলি চতুষ্পাঠী সেখানে ছিল। ইংরাজি শিক্ষার গর্বে তাঁহাকে (দাদা হইলেও) আমি একটি আস্ত জানোয়ার বলিয়া তখন মনে করিয়াছি। কিন্তু আজ বুঝিতে পারিয়াছি প্রকৃত শিক্ষা যাহা সংযম, সততা ও সন্তোষ আনয়ন করে তাহাই তিনি লাভ করিয়াছিলেন (Plain living and high thinking), সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনের সঙ্গে উচ্চ চিন্তার সমাবেশ তাঁহার মধ্যে ঘটিয়াছিল। আর আমি আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর ফলে লাভ করিয়াছিলাম উচ্ছৃঙ্খলতা, অসততা এবং দুরাকাঙ্ক্ষা। বিলাস ব্যসনরত জীবনযাপন এবং কুৎসিত হীন চিন্তা—এই দুটি আমার মধ্যে সমাবেশ ঘটিয়াছিল।

দাদার কথা আমার এই জীবন কাহিনিতে পরে আরও বলিতে হইবে। প্রাচীনকালের গুরুগৃহের শিক্ষার লুপ্তাবশেষ যাহা এখনও চতুষ্পাঠীগুলিতে আছে, তাহার ফলেই যদি দাদার মত চরিত্র সৃষ্ট হয় তাহা হইলে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, সেই প্রাচীন কালের শিক্ষা প্রণালী প্রকৃত মনুষ্যত্ব গড়িয়া তুলিতে কত বেশি কার্যকরী ছিল। এইটুকু বলিয়া আমার জীবন চরিতের এই অধ্যায় আমি শেষ করিলাম।

আমার স্কুলের অবশিষ্ট জীবনের ভিতর আর বিশেষ বৈচিত্র কিছুই নাই। আমি যখন শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইন্‌স্টিটিউসনে পড়ি তখন যাঁহারা সেই স্কুলে পড়িতেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। হুগলি কলেজের প্রিন্‌সিপাল শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য এম. এ. পি. আর. এস. মহোদয় এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। আমি এই স্কুলে ভর্তি হওয়ার পূর্বেই তিনি স্কুল হইতে পাশ করিয়া বাহির হইয়া যান, কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে আসিতেন। তাঁহার ন্যায় অসাধারণ মেধাবী ছাত্রকে আমাদের স্কুলের গৌরব বলিয়া মনে করিতাম। এস. সি. ঘোষ, যিনি শেষে রেলওয়ে বোর্ডের মেম্বার হইয়াছিলেন তিনিও এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনিও আমার ভর্তি হওয়ার পূর্বেই ওই স্কুল পরিত্যাগ করেন। বর্তমান "রামযাদু" প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিমোহন গোস্বামী বি-এ মহাশয় আমাদের সময় ওই স্কুলের হেড্‌মাস্টার ছিলেন। এই শ্যামবর্ণ গোঁপদাড়ি কামান সাধারণ গোছের মানুষটিকে আমরা একদিকে যেমন ভয় করিতাম তেমনি অপরদিকে চরিত্রের গুণে তাঁহাকে অসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি না করিয়া পারিতাম না। শ্রীরামপুরের বর্তমান প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য এম. এ. বি. এল. আমাদের সময় ওই স্কুলের ছাত্র ছিলেন, অবশ্য তিনি আমাদের চেয়ে উপরের শ্রেণিতে পড়িতেন।

আমি এণ্ট্রান্স পাশ করিলে কিছুদিন পরেই স্বদেশি আন্দোলন আরম্ভ হয়। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ স্বরূপ যে ভাবের বন্যা সমস্ত বাংলা দেশকে ভাসাইয়া দিয়াছিল আমিও তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারি নাই। বাঙালির জীবনে সেবার এমন একটা প্রেরণা আসিয়াছিল, যাহার ফলে বাংলার দিকে সমুদয় ভারতের, ভারতের কেন—সমুদয় পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল।

শ্রীরামপুরে মাঝে মাঝে সভা হইতে লাগিল, দেশবিশ্রুত বড় বড় বক্তা যাইয়া বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা বিদেশি বর্জনের জন্য দোকানে দোকানে পিকেটিং করিতে লাগিলাম। এই সময় স্বর্গীয় ডি. এল. রায়ের সেই গান—"বঙ্গ আমার জননী আমার—ধাত্রী আমার—আমার দেশ" আমরা প্রথম শুনিলাম। আমরা সমস্বরে কতকগুলি ছাত্র মিলিয়া ওই গান গাহিয়া ভিক্ষা ও পিকেটিং করিতাম। সেই সময়ে বাংলা দেশে এমন কতকগুলি গান রচিত হইয়াছিল, যাহা ভাবে, ভাষায় ও ব্যঞ্জনায় পৃথিবীর যে কোন জাতীয় সংগীতের তুল্যস্থান অধিকার করিতে পারে। অনুশীলন সমিতি, সুহৃদ সমিতি প্রভৃতি বহু উচ্চশ্রেণির সমিতি তখন স্থাপিত হইয়াছিল। আমরা "তামছা-বাহেবা-শির" ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া তরবারির অনুকল্পে লাঠি লইয়া তরবারি চালনা শিক্ষা করিতাম। শ্রীরামপুরে প্রফেসর মুরতাজা নামক একজন মুসলমান ছিলেন, ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে তিনি সার্কাসের দল লইয়া ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আমরা লাঠি, তরবারি, ছোরা খেলা এবং অন্যান্য কসরৎ শিখিতাম।

এণ্ট্রান্স পাশ করিবার পর এই হুজুগে আমার পড়াশুনা অনেক দিন বন্ধ ছিল। আমার পিতা এই হুজুগের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি বলিতেন যে "গঙ্গাজলে মুরগি সিদ্ধ করে খাওয়া যেমন হিন্দুয়ানি তোমাদের এই স্বদেশিও ঠিক তেমন।"

বাবার সমবয়স্ক অনেকে ইঁহার প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার এই প্রকার মতের কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তাহা এখনও আমার বেশ মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন—

"তোমরা বলিতেছ বিলাতি বর্জন কর—কিন্তু সত্যই কি তাই? সে দিন কলিকাতার একটি বন্ধুর বাড়ি গিয়াছিলাম, তাঁহার বাড়ির ছেলে মেয়েদের কতকগুলি জামা কাপড় তৈয়ারি হইয়া আসিয়াছে দেখিলাম। সবই দেশি কাপড়ের, কিন্তু জিনিসগুলি হইতেছে নিকার-বোকার, ব্লাউজ, কোট, প্যাণ্ট। কাপড়টা স্বদেশি হইবে কিন্তু তদ্দ্বারা জামাগুলি যাহা প্রস্তুত হইবে তাহা বিলাতি সভ্যতার আদর্শে না হইলে চলিবে না—স্বদেশিজাত জুতা পরিবে কিন্তু জুতা তৈরি হইবে বিলাতি জুতার অনুকরণে। বিদেশির অনুকরণে চা না খাইলে চলিবে না, তবে চিনিটা বিদেশি হইলেও কাপটা স্বদেশি হওয়া চাই। তাকিয়া ফরাসে তোমাদের চলিবে না—সোফা কাউচ টেবিল চেয়ার বিলেতি সরঞ্জাম চাই, তবে সেটা ল্যাজারসের বাড়ি হইতে না আনিয়া দেশি দোকান হইতে আনিবে, এইটুকু ত্যাগ স্বীকার তোমরা করিতে প্রস্তুত। বৈদেশিক খাদ্য খাইতেই হইবে তবে তাহা গ্রেট্‌ইস্টার্নে না

খাইয়া কোন স্বদেশি রেস্তোরাঁতে খাইবে, এই তো তোমাদের মনোবৃত্তি! ইহা কি গঙ্গাজলে মুরগি রাঁধা নয়? দেশিয় সরল অনাড়ম্বর আচার ব্যবহার তোমরা ঘৃণা করিতে শিখিয়াছ। বিদেশির আচার ব্যবহার পরিচ্ছদ প্রভৃতির মোহ তোমাদিগের মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহা যদি পরিত্যাগ করিতে না পার তাহা হইলে এই সাময়িক উত্তেজনা বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বড় জোর একটা সাময়িক ফলপ্রসব করিতে পারে কিন্তু তারপর আবার তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

অবশ্য তখন কথাটা খুব ভাল লাগে নাই। তখন আমরা নব উৎসাহে সঞ্জীবীত, নিজেরা নিজকে এক একটা গ্যারিবল্‌ডি বলিয়া মনে করি—পাষণ্ড ইংরেজকে তাড়াইয়া দিয়া দুচার দিনের মধ্যেই আমরা ভারত স্বাধীন করিব, ইহাই আমরা একপ্রকার স্থির করিয়া ফেলিয়াছি—তখন এসব কথা ভাল লাগিবে কেন!

কিন্তু কিছুদিন পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে বাবার ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে।

এই স্বদেশি-আন্দোলনে যোগদান করিয়া পড়াশুনা ত্যাগ করায় বাবা আমার উপর খুব অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু আমি তখন তাহা গ্রাহ্য করি নাই। এই সময় আমি প্রথম কলিকাতায় আসি। আমার এক জ্ঞাতি খুড়া কলিকাতাতে তখন বাস করিতেন, তিনি হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। তিনি স্বদেশি আন্দোলনের একজন পাণ্ডা ছিলেন—আমাকে এ বিষয়ে তিনি খুব উৎসাহ দিতেন। **তাঁহার নাম আমি প্রকাশ করিব না, কারণ তিনি "মানদা" ওরফে "পতিতা মানদার" পিতা।** মানদা যখন তাঁহার নাম গোপন করিয়াছে তখন আমার পক্ষে তাঁহার নাম প্রকাশ করা সঙ্গত হইবে না। তিনি পরবর্তী জীবনে আমার বহু উপকার করিয়াছিলেন, নিজের বাড়িতে রাখিয়া খাওয়াইয়া ভাল একটি চাকুরিও করিয়া দিয়াছিলেন,—**কিন্তু রিপুর তাড়নায়, তাঁহার কন্যাকে গৃহত্যাগিণী করিয়া, তাঁহার উপকারের যে প্রতিদান আমি দিয়াছি তাহাই যথেষ্ট** ; এখন আবার সমাজে তাঁহার নাম প্রকাশ করিয়া তাঁহার উন্নত মস্তক হেঁট করিতে ইচ্ছা করি না।

স্বদেশি আন্দোলন সম্বন্ধে আর বেশি কিছু লিখিবার প্রয়োজন নাই। আন্দোলন হ্রাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি পুনরায় কলেজে ভর্তি হইলাম। ইহার কিছু পূর্বেই আমার পিসিমার মৃত্যু হয়। বৃদ্ধাবস্থায় জ্বরাতিসারে তিনি মারা যান। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব দিবস সন্ধ্যার সময় আমি তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিলাম, এমন সময় পিসিমা আমাকে বলিলেন—"বাবা! আমি তো এবার যাচ্ছি। তুই পড়াশুনা ছেড়ে আর স্বদেশি করিসনে—তোর বাপ মা তোকে দিয়ে কত আশা করেছিল—তুই আবার পড়াশনা কর।"

পিসিমার যে জীবনের আশা নাই তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম। পিসিমার কথা শুনিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম এবং স্বীকার করিলাম আমি আবার পড়াশুনা করিব। পিসিমা হঠাৎ আমাকে বলিলেন—"দ্যাখ তো বাবা কেউ আসছে নাকি।" আমি দরজায় যাইয়া

দেখিলাম—কেহই নাই। আমি পিসিমাকে সে-কথা বলিলাম। পিসিমা তখন বলিলেন—"আমার মাথার নীচে একখানা কাঁথা আছে—টেনে বের কর দেখি।"

আমি আস্তে আস্তে পিসিমার মাথাটা তুলিয়া ধরিয়া বালিস তুলিয়া দেখিলাম সেখানে সযত্নে ভাঁজ করা একখানা কাঁথা রহিয়াছে। পিসিমা বলিলেন—"এই কাঁথাখানার ভিতর তিন হাজার টাকার নোট সেলাই করা আছে। এই টাকাগুলি আমি তোকে দিলাম। বুঝে শুনে খরচ করিস। তোর বাপ তোর উপর বড্ড রেগে আছে, সে যদি তোর পড়ার খরচ না দেয়—এই টাকা দিয়ে তুই কলকাতা যেয়ে পড়বি। তোর বাপকে এ টাকার কথা বলিসনে—সাবধানে টাকাগুলো রেখে দিস।"

আমি অবাক হইয়া গেলাম। পিসিমা অল্প বয়সে বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে আসিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামীর খুব বড় একটা জোত ছিল। বাবাই তাহা আধি হিসাবে প্রতিবৎসর লাগাইয়া দিতেন এবং ফসলের সময় শস্য বিক্রয় করিয়া যাহা পাওয়া যাইত পিসিমাকে আনিয়া দিতেন। এসব কথা আমি জানিতাম। পিসিমা সেই সব টাকা ইচ্ছামত খরচ করিতেন, দুই তিনবার তীর্থ পর্যটনও করিয়া আসিয়াছিলেন, আমার নানাপ্রকার আবদার পালনের জন্যও তিনি বহু টাকা দিয়াছেন, তাহার পরও তিনি এত টাকা জমাইয়াছেন ইহা আমি স্বপ্নেও ধারণা করিতে পারি নাই।

যাহা হউক কাঁথাটা লইয়া আমি বাক্‌সে লুকাইয়া রাখিয়া দিলাম। পরদিন পিসিমা মারা গেলেন। পিসিমার এক জ্ঞাতিকে আনিয়া বাবা তাঁহার দ্বারা শ্রাদ্ধাদি নিজ ব্যয়েই সম্পন্ন করাইলেন। পিসিমার বাক্‌স খুলিয়া নগদ তেত্রিশ টাকা সাড়ে সাত আনা পাওয়া গিয়াছিল। বাবা তাহা ঐ দরিদ্র জ্ঞাতিটিকে দিয়া দিলেন।

পিসিমার মৃত্যুর পর কলিকাতা যাইয়া কলেজে পড়িবার কথা বাবার নিকট প্রস্তাব করিলাম। বাবা আপত্তি করিলেন না। শুভদিন দেখিয়া আমি কলিকাতা যাত্রা করিলাম। যেখানে আমহার্স্ট স্ট্রীট এবং সুকিয়া স্ট্রীট মিলিত হইয়াছে [বর্তমানে রামমোহন সরণি ও কৈলাস বোস স্ট্রিট], তাহারই নিকটে আমহার্স্ট স্ট্রীটের উপরিস্থিত একটি ছাত্রাবাসে আমার থাকবার স্থান করিয়া লইলাম।

কলেজ জীবন

কলেজ জীবন সম্বন্ধে লিখিতে বসিয়া প্রথমেই আমার মনে হইতেছে মেসের কথা। মেস জীবনের অভিজ্ঞতা আমার তখনই প্রথম হইল। এই মেস জীবন আমার নিকট তখন খুব ভালই লাগিয়াছিল। প্রথমত কতকগুলি সহপাঠী ও সমবয়স্কের একত্রে বাস, দ্বিতীয়ত অভিভাবকের কঠিন শাসন হইতে মুক্তি এই, দুইটি জিনসই আমার ন্যায় অপরিণতবয়স্ক যুবকের পক্ষে অত্যন্ত আরামদায়ক বলিয়া মনে হইয়াছিল। স্কুলে মাস্টার মহাশয় দৈনিক পড়া জিজ্ঞাসা করিতেন, পড়া বলিতে না পারিলে নানাপ্রকার শাস্তির বিধান ছিল, তৎপরিবর্তে কলেজে অধ্যাপকের শাসন রহিত অধ্যাপনা ; অধ্যাপক বই খুলিয়া বক্তৃতা করিয়া যাইতেন, আমরা পিছনের বেঞ্চে বসিয়া বেশ গল্প করিতেছি—এই অবাধ স্বাধীনতা, শাসন হইতে অব্যাহতি পাইয়া আমি খুব আনন্দিত হইয়াছিলাম।

আমি যে মেসে থাকিতাম তখন এফ-এ (তখনও আই এ. আই. এস-সি. হয় নাই) ও বি-এ ক্লাসের অনেক ছাত্র এবং ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলেরও কয়েকজন ছাত্র থাকিত। আমি যে ঘরে থাকিতাম সে'টি দুই সিটের ঘর, আমার সঙ্গে থাকিত একটি মেডিকেল স্কুলের ছাত্র। প্রতি মাসে আমার পডার খরচের জন্য বাবা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা দিতেন। খাওয়া ও জল খাওয়া, ধোপা নাপিত কলেজের বেতন ইত্যাদির জন্য এই টাকাই যথেষ্ট ছিল। প্রত্যেক মাসে জমা খরচ আমাকে বাবার নিকট পাঠাইতে হইত। কলিকাতায় অসৎ সংসর্গে মিশিয়া অসৎভাবে কোন টাকা আমি খরচ না করিতে পারি এইজন্যই জমাখরচ দেওয়ার কড়াকড়ি ব্যবস্থা বাবা করিয়াছিলেন। বাবা তো জানিতেন না যে পিসিমার কৃপায় আমার হাতে উচ্ছৃঙ্খলতা পরিতৃপ্তির জন্য যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত ছিল।

বাঁচিয়া থাকিতে আমার উচ্ছৃঙ্খলতার ইন্ধন তিনিই যোগাইতেন, মৃত্যুর সময় কতকগুলি টাকা আমার ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল যুবকের হাতে দিয়া ভবিষ্যৎ অধঃপতনের পথ তিনিই প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতার ন্যায় স্থানে অভিভাবকশূন্য চরিত্রহীন আমার হস্তে ওই অর্থের কী প্রকার সদ্ব্যবহার হইয়াছিল তাহাই ক্রমে বলিব।

আমার সঙ্গে একই কক্ষে যে মেডিকেল স্কুলের ছেলেটি ছিল তাহার নাম বিনোদ। তাহার বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে। অল্পদিনের মধ্যেই তাহার সঙ্গে আমার বিশেষ ভাব হইয়া গেল। বিনোদের সঙ্গে আমার রুচির বেশ খাপ খাইত। তাহার পিতা ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। নানাপ্রকার ছুতা করিয়া সে তাহার পিতার নিকট হইতে প্রতিমাসে ন্যায্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক টাকা আদায় করিত। জামা জুতা এসেন্স ল্যাবেণ্ডার ইত্যাদিতে তাহার যথেষ্ট ব্যয় হইত। প্রসাধনের নিত্য নূতন সামগ্রী তাহার টেবিলে আমদানি হইত। আমিও

বাবুগিরিতে তাহা অপেক্ষা কম ছিলাম না। মেসের অপরাপর ছেলেরা ঠাট্টা করিয়া আমাদের নাম দিয়াছিল—"মানিকজোড়"।

একদিন বিনোদ কি কাজের জন্য বাহিরে গিয়াছে, আমি আমার বিছনায় শুইয়া আছি। সেদিন ভয়ানক গরম। বিনোদের বিছানাটা যে দিকে ছিল, সেই দিকে একটু হাওয়া পাওয়া যাইবে মনে করিয়া আমি বিনোদের বিছানায় যাইয়া শুইলাম। বিছানায় শুইয়া পাশ ফিরিতেই পিঠে একটা শক্ত কী যেন লাগিল। বিছানার চাদর উঠাইয়া দেখিলাম, প্রকাণ্ড একটি কাগজের লেফাফার মধ্যে একখানা পিচ-বোর্ডের মতন কী যেন রহিয়াছে। বাহির করিয়া দেখি একখানা ফটোগ্রাফ। ফটোগ্রাফটি একটি যুবতী রমণীর। ব্রাহ্মিকাগণের ন্যায় কাপড় পরা, পায়ে লেডিজ সু ; একটি টেবিলের উপর কনুইতে ভর দিয়া দাঁড়ান। ফটোখানার পশ্চাৎ দিকে লেখা আছে—

"Forget me not"
From—A to B

অর্থাৎ "আমাকে ভুলিও না"—'এ' কর্তৃক 'বি'-কে প্রদত্ত লইল। "বি" যে আমাদের বিনোদ তাহা বুঝিতে পারিলাম কিন্তু "এ"টি কে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। না বুঝিলেও তিনিই যে এই ছায়াচিত্রের কায়া (original) তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বিনোদের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক অনুমান করিয়া লইতেও বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। ফটোগ্রাফখানি আমার টেবিলের দেরাজে চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া আমি আমার নিজের বিছানায় আসিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর বিনোদ ফিরিয়া আসিল। আমি আমার বিছানায় শুইয়া আছি, তখন দেখি বিনোদ তাহার বিছানা উলটাইয়া, টেবিলের দেরাজ বাক্স খুলিয়া কাপড়-চোপড় মেজেয় ছড়াইয়া কী যেন খুঁজিতেছে। আমার অবশ্য বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না, কিন্তু আমি ঘুমের ভাণ করিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর বিনোদ বিছানায় বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। বিনোদ এক লাফে আমার বিছানার উপর আসিয়া আমাকে ভীষণ একটা ঝাঁকুনি দিয়া বলিল,—"রাস্‌কেল—কোথায় রেখেছিস্ বল্!" আমি বলিলাম—"কী কোথায় রেখেছি?" বিনোদ দুমদাম করিয়া আমাকে কয়েকটি কিল বসাইয়া দিয়া বলিল—"আর ন্যাকামি কত্তে হবে না, ফটোখানা দে!"

আমি বলিলাম—'অত সহজে হচ্ছে না বাছাধন। ব্যাপারটা কি খুলে বল, তারপর কিছু খরচ কর, তা'হলে না হয় খুঁজে দেখা যাবে।"

বিনোদকে আরও কিছু ঠাট্টা তামাসা করিয়া ফটোখানা বাহির করিয়া দিলাম। বিনোদের নিকট জানিতে পারিলাম, রমণীটির নাম অনিলা, তাহাদের হাসপাতালের একজন (Nurse) শুশ্রূষাকারিণী। মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের হাসপাতালের ডিউটি খাটিতে হয় ; রাত্রিতে ডিউটি খাটিবার সময় কয়েকমাস পূর্বে অনিলার সঙ্গে তাহার আলাপ হয়। আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। অনিলা একজন দেশিয় খ্রীস্টানের কন্যা। তাহার

পিতা নাই। মাতা ও একটি ছোট ভ্রাতা বর্তমান। অনিলার এবং তাহার মাতার উপার্জন দ্বারা কোন প্রকারে সংসার প্রতিপালিত হয়। তাহার মাতা একটি খ্রীস্টান বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়ত্রীর কার্য করেন। বিনোদ নানাপ্রকারে সেই সংসারে এখন সাহায্য করিতেছে। অনিলার মাতা ব্যাপার যে না বুঝিতে পারিয়াছেন তাহা নহে ; কিন্তু তিনি ইহাতে আপত্তি করেন না। বিনোদ সেই বাড়িতে গেলে তাহাকে চা প্রভৃতি দ্বারা আদর অভ্যর্থনা করিয়া অনিলার ভাইটিকে সঙ্গে করিয়া তিনি কোন ছুতা করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যান।

এই সব কথা জেরা করিয়া আমি বিনোদের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম। বিনোদ একেবারে মাতিয়া গিয়াছে। সে অনিলাকে বিবাহ করিবে ইহাই তাহার সংকল্প, কিন্তু কেবল পিতার ভয়ে পারিতেছে না। ডাক্তারি পাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সে অনিলাকে বিবাহ করিবে ইহাই তাহার ইচ্ছা।

আমি বলিলাম—“বাপ যে তা'হলে ত্যাজ্য পুত্তুর কর্‌বে—”সে বলিল “তখন নিজে রোজগার করেই চালাতে পারব, না হয় ভিক্ষে করে সংসার চালাব, তবু আমি অনিলাকে ছাড়তে পারব না।”

সেদিন এ পর্যন্তই শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার দুই তিন মাস পরেই বিনোদ ও অনিলার প্রেমনাটকের যবনিকা পতন হইয়াছিল। সেই কাহিনি বিস্তারিত বলিতে গেলে পুথি বাড়িয়া যায় ; মোট কথা বিনোদের ক্লাসের আরও দু'টি ছাত্রের সঙ্গে অনিলার ঠিক ওই প্রকার সম্বন্ধ বিনোদের নিকট ধরা পড়িয়া যায়। সে বুঝিতে পারে যে অনিলার মাতা অনিলার বিভিন্ন বন্ধু দ্বারা অর্থোপার্জনের বেশ একটা পন্থা আবিষ্কার করিয়া লইয়াছেন। বেচারা বিনোদ যেদিন এই ঘটনা জানিতে পারিয়াছিল, সেদিন তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে আমাকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল। আমি বিনোদ অপেক্ষা বয়সে ছোট হইলেও, তাহা অপেক্ষা এই সব ব্যাপারে একটু বেশি অভিজ্ঞ বলিয়াই নিজেকে তখন মনে করিয়াছিলাম। তাহার হা-হুতাশ এবং আক্ষেপোক্তিকে হাস্যজনক মনে করিয়া তাহাকে স্পষ্টই বলিলাম যে—“ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দাও যে তুমি রক্ষা পেয়েছ, তাকে তোমার বে করতে হয় নি। পয়সা যখন আছে—আবার খরচ কর, অমন ঢের মিলবে, সেইতো ভাল। একটা নিয়ে থাকার চেয়ে নূতন নূতন যদি মেলে সেইটেই কি ভাল নয়!”

তখন বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু এখন চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে বিনোদ যে চোখে ব্যাপারটি দেখিয়াছিল আমি সে চোখে ব্যাপারটি দেখিতে পারি নাই। আসঙ্গ লিপ্সাই পুরুষকে নারীর দিকে টানিয়া লইয়া যায় একথা সত্য। রমলার প্রতি আমার আকর্ষণ, যাহা পূর্বে বলিয়াছি, তাহাও সেই আসঙ্গ লিপ্সা সঞ্জাত, আর অনিলার প্রতি বিনোদের যে আকর্ষণ তাহাও সেই আসঙ্গ লিপ্সারই ফল। পরিণামে আমার ও বিনোদের উভয়েরই পতন হইয়াছিল। কিন্তু পতন হইলেও আজ আমার মনে হইতেছে, এই দুই পতনের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। আমি বিনোদ হইতে বেশি পতিত। আমি রমলাকে পাইবার জন্য লালায়িত হইয়াছিলাম দৈহিক লালসার উত্তেজনায়, তাহাই আমার কাম্য ছিল এবং সেই

কামনা পুরণের জন্যই আমার সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত হইয়াছিল। আমার নিকট রমলা পাপ দমনের একটি পাত্র ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। রমলার ব্যক্তিত্ব আমাকে আকর্ষণ করে নাই, করিয়াছিল তাহার নারীত্ব। কিন্তু বিনোদ অনিলাকে প্রকৃত ভালবাসিয়াছিল, পত্নীর গৌরবময় আসনে অনিলাকে বসাইবে, ইহাই তাহার কাম্য ছিল। অনিলার ব্যক্তিত্ব ও নারীত্ব উভয়ই তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল। ক্ষণিকের মোহেই হউক অথবা অনিলার প্ররোচনাতেই হউক, যদিও বিবাহের পূর্বেই বাসনা চরিতার্থ করিবার সুযোগ তাহাদের ঘটিয়াছিল তথাপি তাহাই তাহার একমাত্র কাম্য ছিল না। অনিলার বিশ্বাসঘাতকতাই তাহার প্রাণে অত বেশি আঘাত দিয়াছিল। সেইজন্যই বলিতেছিলাম, যদিও আমরা দুজনেই পাপী তথাপি আমার তুলনায় বিনোদের চরিত্র অনেক উন্নত ছিল, একথা আমি আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। বিনোদের পরবর্তী জীবন যেটুকু আমার সঙ্গে কাটিয়াছিল, তাহাও আমার এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। কারণ, তাহাকে অন্য নারীব প্রতি আসক্ত করিতে পারি নাই, যদিও তার সুযোগ আমি অনেকবার দিয়াছিলাম। ইহাই ছিল বিনোদের বিশেষত্ব।

এখন আমার নিজের কথা আরম্ভ করিতে হইতেছে। আমার কলেজ জীবনে আমি অনেক কলেজ বদলাইয়াছি। স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে আমি বি-এ পাশ করি। কিন্তু তাহার পূর্বে বিদ্যাসাগর, সিটি, রিপন প্রত্যেক কলেজেই আমি পড়িয়াছি। এই কলেজ পরিবর্তনের কারণ এক এক সময় এক একটি ঘটিয়াছিল। সে সমুদয় কারণ বলিতে যাইয়া সময় নষ্ট করিতে চাই না। কলেজে আমি নিয়মিত ভাবেই যাইতাম, পড়াশুনাও করিতাম, কিন্তু শনি ও রবিবারে থিয়েটার দেখা আমার একরকম বাঁধা ছিল। স্বর্গীয় অমর দত্ত মহাশয় তখন থিয়েটারের পাণ্ডা ছিলেন। নাচগান হর্‌রা তখন খুব বেশি ছিল।

বাল্যকাল হইতেই আমার কণ্ঠস্বর খুব মধুর ছিল কিন্তু রীতিমত গান শিখিবার সুযোগ তখনও হয় নাই, কেবল স্বদেশি গান গাহিয়া বেড়াইতাম। কলিকাতা আসিয়া গান আরম্ভ করিলাম এবং অল্প দিনেই সুগায়ক বলিয়া আমার একটা খ্যাতি জন্মিল।

তখন এখনকার মত অলিতে গলিতে রেস্টুরেন্ট (Resturant) হয় নাই। দু'টি চারিটি হইয়াছিল। সেই সকল রেস্টুরেণ্টে হিন্দুর নিষিদ্ধ পক্ষীর মাংসে ক্রমে ক্রমে আমরা অভ্যস্থ হইয়া উঠিয়াছিলাম। একথা বলাই বাহুল্য যে, সমপাঠীদের মধ্যে আমার এমন কতকগুলি বন্ধু জুটিয়াছিল, যাহাদের প্ররোচনাতেই আমি এই সকল ব্যাপারে অভ্যস্থ হইতেছিলাম।

আমাদের আর একটি কার্য ছিল, রবিবারে কোন ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া। উপাসনা করিতে অথবা ধর্মভাব প্রণোদিত হইয়া নয়, ব্রাহ্ম মহিলাদিগকে দেখিতে—এবং পরে নিজেদের মধ্যে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কুৎসিত প্রবৃত্তির উত্তেজনার পক্ষে সাহায্য করিতে।

পূর্বে বলিয়াছি বেশ্যাদের প্রতি আমার একটা ঘৃণা ছিল, কিন্তু কলিকাতায় থিয়েটার

দেখিবার পর হইতে সেই ঘৃণার ভাব আমার ক্রমশ হ্রাস হইতে লাগিল। রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোক, তাহাদের সুন্দর সুবেশ মূর্তি ও তাহাদের হাবভাবময় অভিনয় দেখিয়া আমার মনে হইত যেন তাহারা অন্য জগতের মানুষ। আমি আমার একজন কলিকাতার অধিবাসী বন্ধুর সাহায্যে থিয়েটারের কয়েকজন অভিনেতার সহিত পরিচয়ের সুযোগ করিয়া লইলাম। তাহাদের খাতিরে থিয়েটারের গ্রীন-রুম্ অর্থাৎ সজ্জাগৃহে প্রবেশের অধিকার প্রাপ্ত হইলাম। আমি একজন খুব ধনী লোকের পুত্র বলিয়া বন্ধুটি আমার পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং অভিনেত্রী এবং নর্তকীদের সঙ্গে পরিচিত হইতেও আমার বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। নামজাদা অভিনেত্রী তখন যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই কোন বড় অভিনেতার, অথবা ম্যানেজারের অথবা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের মধ্যে কাহারও না কাহারও বাঁধা ছিলেন। তাঁহাদের দিকে নজর দেওয়া বড় সহজ ছিল না। ছোট খাটো অভিনেত্রী অথবা নর্তকী দলে (Dancing batch) দুই চার জনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হওয়ার সুযোগ আমার ঘটিয়া উঠিল। ক্রমে তাহাদের কাহারও গৃহে রাত্রিযাপন করিতে লাগিলাম। অবশ্য ইহাতে টাকা খরচও হইতে লাগিল—আমার বরাদ্দ মাসিক টাকা হইতে এই সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হওয়া সম্ভব ছিল না। ডাক্তারের ভিজিট, ঔষধের দাম, দুধের দাম, কলেজের চাঁদা ইত্যাদি নানা প্রকার মিথ্যা অজুহাতে বাবার নিকট হইতে প্রতি মাসে কিছু বেশি টাকা আনিতে লাগিলাম। পিসিমার প্রদত্ত টাকাটা স্থায়ী হেডে ব্যাঙ্কে রাখিয়া দিয়াছিলাম, তাহা উঠাইবার উপায় ছিল না। কিন্তু তাহার সুদ বাৎসরিক প্রায় পৌনে তিনশত টাকা এবং বাবার নিকট হইতে জুয়াচুরি করিয়া যে টাকা অতিরিক্ত লইয়া আসিতাম তদ্দ্বারাই এই সকল খরচ চলিত।

এই সময়ই বিনোদকে আমার দলে ভিড়াইতে কয়েকজন অভিনেত্রীর দ্বারা চেষ্টা করি। সে আমাদের সঙ্গে যাইত কিন্তু বহু প্রলোভনেও তাহাকে কোন অন্যায় কার্যে প্রণোদিত করিতে পারি নাই, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

কিছুদিন পরে অভিনেত্রীর সংসর্গ আমার বিশেষ ভাল লাগিত না ; অথচ প্রবৃত্তির তাড়নায় স্থিরও থাকিতে পরিতাম না। এই সময় একদিন আমি ও আমার একজন সহপাঠী ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার পর ফিরিতেছি, এমন সময় আমাদের কলেজের একটি প্রফেসারের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি ব্রাহ্ম, উপাসনা করিয়া ফিরিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে একটি সুন্দরী মেয়ে দেখিলাম। পরে জানিয়াছিলাম সেটি তাঁহার কন্যা। কন্যাটির বয়স পনের কি ষোল হইবে। আমি তাঁহাকে দেখিয়া নমস্কার করিতেই তিনি প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন—

"কে ও রমেশ যে—তুমি এখানে কি মনে করে?"—

আমি বলিলাম—"আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর উপদেশ শুন্‌তে এসেছিলাম স্যার।"

তিনি বলিলেন—"বটে কেমন শুন্‌লে!"

বাস্তবিক পক্ষে সেদিন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ আমি খুব মনোযোগ দিয়াই শুনিয়াছিলাম। বেদী হইতে সেই দেবচরিত্র বৃদ্ধ সেদিন এমনই সুন্দর প্রাণস্পর্শী ভাষায়

বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে আমার ন্যায় লম্পট মাতাল, কুপ্রবৃত্তি লইয়াই যাহারা তথায় যায়, তাহারাও তৎকালের জন্য আকৃষ্ট না হইয়া পারে নাই। সুতরাং আমি খুব উৎসাহের সহিতই উত্তর দিলাম—"খুব চমৎকার স্যার।"

অধ্যাপক মহাশয় আমার উৎসাহ দেখিয়া হাসিলেন। অধ্যাপকটির বিশেষত্ব এই ছিল যে তিনি ক্লাসের প্রায় ছেলেকেই চিনিতেন এবং নাম ধরিয়া ডাকিতেন। তাঁহার নিকট কোন ছেলের ফাঁকি দেওয়ার উপায় ছিল না।

প্রত্যেক কথাতেই নানারকম জেরা করা তাঁহার অভ্যাস ছিল। ক্লাসে পড়াইতে পড়াইতে তিনি অনেক সময় বলিতেন— "You understand," (বুঝতে পাচ্ছ?) যদি কেহ কিছু না বলিত, তাহা হইলে কোন বিপদ ছিল না—তিনি আপন মনে পড়াইয়া যাইতেন এবং মাঝে মাঝে "You understand" (অর্থাৎ বুঝতে পাচ্ছ?) বলিয়া যাইতেন। কিন্তু যদি কোন হতভাগ্য ওই প্রকার "You understand"এর উত্তরে "Yes sir" (হ্যাঁ বুঝতে পাচ্ছি) বলিত, তাহা হইলে রক্ষা থাকিত না। তাহাকে তখনই দাঁড়াইতে হইত এবং কী বুঝিতে পারিয়াছে তাহা বুঝাইয়া বলিতে হইত। যদি বলিতে পারিত তাহা হইলে কোন কথা ছিল না, কিন্তু যদি না বলিতে পারিত তাহা হইলে তাহার তীব্র বিদ্রূপে তাহাকে অস্থির হইতে হইত। তিনি একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিতেন— "I understand that you understand—nothing (অর্থাৎ "অমি বুঝতে পাচ্ছি যে তুমি কিছুই বুঝতে পার নাই)। ক্লাসের বাহিরেও যে ছাত্র দেখিলেই অধ্যাপক মহাশয়ের সেই জেরা করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিবে ইহা আমার ধারণা ছিল না ; তাহা থাকিলে হয়তো প্রথমেই পাশ কাটাইয়া যাইতাম। সুতরাং যখন অধ্যাপক মহাশয় পুনরায় জেরা করিলেন—"কোন্ কথাগুলি চমৎকার লাগল?"—তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে এই প্রশ্ন ক্লাসের সেই "What do you understand" (কি বুঝতে পারলে?") প্রশ্নেরই রূপান্তর মাত্র। সৌভাগ্যক্রমে বক্তৃতাটি মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছিলাম এবং বেশ মনে ছিল, তাই কেবল জব্দ হইলাম না। যে কথাগুলি বেশ ভাল লাগিয়াছিল সেইগুলি গুছাইয়া বলিলাম। অধ্যাপক মহাশয়ের ভাবে বুঝিলাম, তিনি বেশ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কথা বলিতে বলিতে আমরা সমাজগৃহ ছাড়িয়া ফুটপাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, অধ্যাপক মহাশয় আমার স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করিয়া সস্নেহে বলিলেন—"বেশ, বেশ, এ সব কথাগুলি যে তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনেছ এতে আমি খুব খুশি হলাম। আচ্ছা আমরা তবে যাই। এস লীলা", বলিয়া কন্যাকে লইয়া গাড়িতে উঠিলেন। কন্যাও এতক্ষণ একপাশে দাঁড়াইয়া তাহার পিতার প্রশ্ন এবং আমার উত্তর শুনিতেছিল, কোন কথাই বলে নাই। পিতার ডাকে যাইয়া গাড়িতে উঠিল, আমি কপাল মুষ্টি ঠেকাইয়া অধ্যাপককে স্যালিউট এবং লীলাকে একটা নমস্কার করিলাম। লীলাও তাহার ছোট হাত দুটি জোড় করিয়া একটি প্রতিনমস্কার করিল।

আমরা মেসে ফিরিয়া আসিলাম। আমার এই সহপাঠী ও আমি মেসে একই কক্ষে বাস

করিতাম। বিনোদ সে সময় পাশ করিয়া চলিয়া গিয়াছে! আমার এই সহপাঠী বর্ধমান জেলার একটি জমিদারের ছেলে। তাঁহার পিতা ছিলেন না। বিধবা মাতাই একমাত্র অভিভাবিকা ছিলেন। মাতার নিকট হইতে ইচ্ছামত অর্থ সে প্রতি মাসে আনিত। মেসের প্রত্যেক ছাত্রকেই টাকা পয়সার অভাব হইলে সে টাকা ধার দিত কিন্তু টাকার জন্য বিশেষ তাগাদা করিত না। আমিও অনেক সময় তাহার নিকট হইতে টাকা ধার করিতাম। ইহার নাম আমি গুণেন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করিব। ইহার চরিত্র আমারই অনুরূপ ছিল। গুণেন্দ্র এবং আমি উভয়েই থিয়েটারের গ্রীনরুমে একত্র প্রবেশলাভ করি এবং অভিনেত্রীদের সহিত পরিচয়, তাহাদের গৃহে রাত্রি যাপন ইত্যাদি কার্যে সে আমার সহকারী ছিল। অবশ্য এই সকল কাজ আমাদের খুব লুকাইয়া করিতে হইত। যেদিন অভিনেত্রীর বাড়িতে রাত্রিযাপন করিতাম সেদিন কোন আত্মীয় বাড়ি নিমন্ত্রণ আছে বলিয়া যাইতাম।

আমি ও গুণেন্দ্র সমাজ হইতে যখন বাসায় ফিরতেছিলাম তখন গুণেন্দ্র নানা কথা বলিতেছিল কিন্তু আমি মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছিলাম। আমি কেবল লীলার কথাই ভাবিতেছিলাম। তাহার সুন্দর দেহ, টানা টানা দু'টি চোখ, তাহার নমস্কারের সুন্দর ভঙ্গিমা আমার মনের মধ্যে।

গুণেন্দ্র বলিল "কি ভাবছিস বল্‌তো? লীলাময়ীর রূপ!" আমি বলিলাম—"যাঃ— আবোল তাবোল বকিস্‌নে"। গুণেন্দ্র বলিল—"আবোল তাবোল আমি বলছি না তুই আবোল তাবোল ভাবছিস! ঠিক করে বল্ দেখি তুই লীলার কথা ভাবছিলি কিনা।"

আমি শেষটায় তাহার নিকট মনের কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম। অনেক রাত্রি পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে লীলার কথা আলোচনা হইল। গুণেন্দ্র হঠাৎ বলিয়া বসিল—"এতই যখন মজেছিস্ তখন একটা কাজ করে ফেল, প্রফেসারকে প্রাইভেট টিউটার রেখে নে। এক ঘণ্টা করে তাঁর বাসায় যেয়ে পড়ে আসবি। মাসে গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিলেই হবে। রোজ বাসায় গেলে লীলার সঙ্গে দেখা হবে। Try your luck and see what you can do (ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখ কি করতে পারিস্)।" আমি বলিলাম—"মাসে পঞ্চাশ টাকা আসবে কোথা থেকে, আমি তো তোর মত বড়লোক নই।" সেদিনের মত আর বিশেষ কোন কথা হইল না ; কিন্তু গুণেন্দ্রের শেষ প্রস্তাব (Suggestion) ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার মাথায় খেলিতে লাগিল। ইহার দুই চার দিন পর আমি ব্যাঙ্ক হইতে দুইশত সত্তর টাকা সুদ পাইলাম। তখন মনে হইল যে ইহা দ্বারা অন্তত পাঁচ মাস পড়া হইবে। যদি ভাগ্যে থাকে এই পাঁচ মাসেই আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। এই টাকা হাতে পাওয়ার পর এক শনিবার আমি বাড়ি যাইয়া বাবাকে জানাইলাম যে আমার পড়াশুনার সাহায্য করিবার জন্য একজন গৃহশিক্ষক প্রয়োজন। মাসিক পঞ্চাশ টাকার কথা বাবাকে বলিতে সাহসী হইলাম না ; বলিলাম মাসিক পঁচিশ টাকা দিলেই অধ্যাপকের বাড়িতে গিয়া পড়াশুনা বুঝিয়া আসিতে পারিব। বাবা মাসিক পঁচিশ টাকা করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। আমি তাহার পরদিনই অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট গুণেন্দ্রকে পাঠাইয়া তাঁহার নিকট প্রাইভেট পড়িবার

প্রস্তাব করিলাম। তিনি স্বীকৃত হইলেন। মাসিক পঞ্চাশ টাকা দিতে হইবে। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর এক ঘণ্টা আমি তাঁহার বাড়িতে যাইয়া পড়িব স্থির হইল।

প্রথম যে দিন পুথি ও খাতা বগলে পড়িতে বাহির হইলাম সে দিন গুণেন্দ্র আমাকে খুব একচোট ঠাট্টা করিল। ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া অনুচ্চস্বরে বারকতক হুলুধ্বনি করিল, তারপর "I wish you good luck" (তোমার শুভ কামনা করি) বলিয়া আমায় বিদায় দিল।

আমি যখন অধ্যাপকের বাড়িতে পৌঁছিলাম তখন মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। নীচের ঘরে একখানি টেবিল ও তাহার চারিদিকে কয়েকখানি চেয়ার এবং একপাশে দু'টি আলমারি ছিল। আমি সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া একটি ছোট ছেলেকে দেখিতে পাইলাম। ছেলের মুখখানি লীলার মতই। আমার মনে হইল সে লীলারই ভাই। পরিচয় লইয়া জানিলাম তাহাই বটে। তাহার দ্বারা উপরে খবর পাঠাইয়া দিতেই আমার উপরে যাইতে ডাক আসিল। আমি উপরে গেলাম। যে ঘরটিতে অধ্যাপক মহাশয় ছিলেন সেটি নীচের ঘর হইতে বড়। ঘরের মেজেয় একখানা কারপেট, কয়েকটা সোফা, এক কোনে একটি অরগ্যান, মাঝখানে মান্দ্রাজের তৈয়ারি কালো কাঠের একটি বড় টিপয়, এক দিকে সারি সারি দেরাজওয়ালা একটি হাফ-আলমারি, তাহার উপর কতকগুলি পুতুল সাজান ; ইহাই ঘরখানার আসবাব। দেওয়ালে রামমোহন রায়, কেশব সেন প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত লোকের ছবি, প্রত্যেকটি দরজা ও জানালায় পর্দা।

ঘরখানায় বেশি আসবাব পত্র নাই, কিন্তু এই সামান্য কয়েকটি জিনিসই এমন সুন্দরভাবে সজ্জিত যে তাহা দেখিলেই গৃহস্বামীর মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। ঘরে অধ্যাপক মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী বসিয়াছিলেন। লীলা অধ্যাপকের সম্মুখে একটি মিউজিক টুলে বসিয়াছিল। আমাকে দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন—"এই যে—রমেশ এসেছ—বসো—তাহার পর স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এই রমেশ, এর কথাই তোমাকে কাল বলেছি"—আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ইনি আমার স্ত্রী"। আমি অধ্যাপকপত্নীর পায় হাত দিয়া প্রণাম করিলাম,—তিনি সস্নেহে আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—"থাক থাক। বসো বাবা বসো।" অধ্যাপক মহাশয় আমাকে প্রণাম করিতে দেখিয়া হাসিয়া স্ত্রীকে লক্ষ করিয়া বলিলেন—"তোমাদের বরাতই ভাল, এতদিন ধরে পড়াচ্ছি, ছাত্রের কাছে কোনদিন প্রণাম পাই নি, মাথার সঙ্গে মুষ্ঠি ঠেকিয়েই খালাস, মুষ্ঠি ঠেকিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলও অনেকে দেখায়, আর তুমি প্রথম দিনই একেবারে প্রণাম পেয়ে গেলে।"

অধ্যাপক মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম, অধ্যাপক মহাশয় তারপর লীলাকে বলিলেন "লীলা—তোমার সঙ্গে রমেশের পরিচয় করে দিই।" লীলা আমাকে একটি নমস্কার করিয়া বলিল—"সেদিন সমাজ থেকে আসতে রমেশবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল না বাবা!"

অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ—আমার সে কথা মনেই ছিল না।" আমি লীলাকে প্রতি নমস্কার করিলাম। তারপর অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন—"আজকে প্রথম দিন আর পড়াশুনায় কাজ নেই—তার চেয়ে লীলার একটা গান শোনা যাক—কি বল রমেশ।"

আমি ঘাড় নাড়িয়া আমার সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। লীলা অরগানের ডালা খুলিয়া গান ধরিল—এই দীর্ঘকাল পরও সেদিনের গানের দুই চারিটি 'কলি' আমার মনে আছে—

কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি
বাঁশির তানে গুঞ্জরে
বকুলগুলি আকুল হয়ে
বাঁশির তানে মুঞ্জরে

লীলার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল, তাহার দিক হইতে আমি চোখ ফিরাইতে পরিতেছিলাম না। গান শেষ হইলে অজ্ঞাতসারে আমার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল—"চমৎকার"। কথাটি বলিয়া ফেলিয়া আমি যে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। অধ্যাপক মহাশয় এবং অধ্যাপক পত্নী একটু হাসিলেন। লীলাও একটু লজ্জিত হইল এবং সুখীও হইল, কারণ আমার প্রশংসা বাক্যের অকপটতা (Sincerity) সে বুঝিতে পারিয়াছিল।

এমন সময় একটি ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া একজন ভৃত্য প্রবেশ করিল। অধ্যাপক পত্নী লীলাকে চা করিতে বলিলেন এবং আমার জন্য এক পেয়ালা করিতে বিশেষভাবে বলিলেন। অধ্যাপক মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"কি রমেশ। চা খাবেতো? শুনেছি তুমি গোঁড়া-হিন্দুর ছেলে, আমার এখানে চা খেলে সমাজ একঘরে করবে না তো?" আমি একটু হাসিয়া মাথা নত করিয়া বলিলাম "আমার কোন গোঁড়ামি নেই স্যর্। চা কেন মা যদি ভাত খেতে দেন তাও খেতে আমার আপত্তি নেই।"

অধ্যাপক মহাশয় খুশি হইলেন—বলিলেন—"বেশ। বেশ। এই তো চাই। তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা। তোমরা যদি সংকীর্ণতার গন্ডিতে নিজেকে বেঁধে রাখবে তা হলে দেশটা জাগবে কি করে? চায়ের সঙ্গে কয়েকখানা করিয়া স্যাণ্ডউইচ এবং একখানা করিয়া কেক ছিল। আমরা সকলেই তাহার সদ্ব্যবহার করিলাম। তাহার পর লীলা একটা গান করিল। গান শেষ হওয়ার পর লীলা তাহার মাকে বলিল—"রমেশ বাবু নিশ্চয়ই গান গাইতে জানেন। ওকে একখানা গান গাহিতে বল না।"

অধ্যাপক পত্নী সহাস্যমুখে আমাকে বলিলেন—"লীলা কি বলছে শুন্ছো রমেশ? তুমি গাইতে জান নাকি? জান তো একটা গান শোনাও আমাদের।"

আমি আমতা আমতা করিতে লাগিলাম। গান গাইতে জানি না—এমন জলজ্যান্তো মিথ্যা কথা বলিতেও বাধ বাধ বোধ হইল, অথচ অধ্যাপক মহাশয়ের সম্মুখে গান

গাহিতে জানি বলিতেও কেমন একটা লজ্জার ভাব আসিয়া পড়িল। আমার এই ইতস্তত ভাব দেখিয়া অধ্যাপক পত্নী হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন—"রমেশ নিশ্চয়ই গাইতে জানে। তুমি তার মাস্টার মশায়, তোমার সামনে সে কথাটা স্বীকার কর্তে চাচ্ছে না।"

অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন—"লগুড় হাতে গুরুমহাশয়ের ভয় আজকাল আর নেই। আমরা ছাত্রকে বন্ধু বলে মনে করি এবং তারাও আমাদের বন্ধু বলে মনে করবে—আমরাও তাই চাই।"

অধ্যাপক পত্নী বলিলেন—"তবে আর কি রমেশ! এইতো হুকুম পেলে, এখন গাও"—

লীলাও বলিল—"একটা গান না রমেশ বাবু!"

আমি বলিলাম—"আমি তেমন ভাল গাইতে জানি না—তারপর আপনার এই সুন্দর গানের পর—" বলিতে বলিতেই লীলা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"আমরা মনে করে নেব অপরিচিত স্থানে গান গাইবার পূর্বে যেটুকু ভদ্রতা করা প্রয়োজন, আপনি তা করেছেন। এখন উঠুনতো—একটা গান।"

অধ্যাপক মহাশয় ও তাঁহার পত্নী খুব হাসিয়া উঠিলেন। আমিও সেই হাসিতে যোগ দিলাম। তারপর উঠিয়া অরগ্যানের কাছে যাইয়া বসিলাম ও একটা হিন্দি গান গাহিয়াছিলাম। লীলার কণ্ঠস্বর মধুর হইলেও উচ্চ সংগীতে তাহার শিক্ষা ছিল না। আমি ওস্তাদের নিকট রীতিমত বিশুদ্ধ লয়ে সংগীত শিখিয়াছিলাম। লীলার চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য সেদিন আমার সমুদয় প্রাণ ঢালিয়া দিয়া গানটি গাহিয়াছিলাম। সুতরাং আমার গান শেষ হওয়ার পর সকলেই খুব বিস্মিত হইয়াছিলেন। আমাকে গান গাহিতে অনুরোধ করিবার পর সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে সাধারণ স্কুল কলেজের ছেলেরা যেমন গায় আমিও তেমনি গাহিব ; কিন্তু আমি বিশুদ্ধ তান লয়ে এমন সুন্দর ভাবে গান গাহিব ইহা তাঁহারা কেহই আশা করেন নাই। অধ্যাপক মহাশয় প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—"তাইতো! তুমি যে অবাক করে দিলে হে রমেশ! তুমি এমন সুন্দর গাইতে পার তাতো মনে করিনি।"

লীলা বলিল—"আমার গান শুনে রমেশবাবু নিশ্চয়ই মনে মনে হাসছিলেন। আগে জানলে ওঁর সামনে গাইতুম না।"

আমি বলিলাম—"আপনি যে সুন্দর গান শুনিয়েছেন তার কথা আমি জীবনে ভুলতে পারব না। এমন মিষ্টি গলার স্বর আমি জীবনে কোন দিন শুনিনি।"

অধ্যাপক পত্নী বলিলেন—"লীলার সুর মিষ্টি হলেও সে গান কিছুই শেখেনি। তুমি তো রীতিমত ওস্তাদ দেখছি।"

আমি বলিলাম—"না না—আমি এখনও ওস্তাদ হইনি, তবে গান শিখতে চেষ্টা কচ্ছি মাত্র।"

অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন—"থাক তর্ক করে সময় নষ্ট করে কাজ নেই, তার চেয়ে রমেশ আর একটা গান গাও।"

আমি আরও একটা গান গাহিলাম। তারপর বহু সাধ্যসাধনা করিয়া লীলার আর একটা গান শুনিলাম। ইহার পর সেদিনের মত বিদায় লইয়া আসিলাম।

বাসায় আসিয়া গুণেন্দ্রকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম। গুণেন্দ্র আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—"বহুৎ আচ্ছা বাবা, একদিনেই অনেক এগিয়েছ দেখছি।"

পরদিন হইতে আমি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট পড়িতে যাইতে আরম্ভ করিলাম। কোন কোন দিন লীলার সহিত দেখা হইত, কোন দিন বা হইত না। শনিবার রাত্রিতে অধ্যাপক মহাশয় পড়াইতেন না। সেদিন উপরের ড্রয়িং রুমে গান ও গল্পের মজলিস বসিত। আমাকে গান গাহিতে হইত, লীলাও গাহিত। লীলার বন্ধু ও আর দুচারটি প্রগতিপ্রাপ্তা মহিলা মাঝে মাঝে আসিতেন, তাহারাও গান গাহিতেন। তাহারাও কুমারী এবং দেখিতে সুন্দরী। আমি তাহাদের সকলের সঙ্গেই পরিচিত হইলাম। আমার সুকণ্ঠ এবং সংগীত শাস্ত্রে অভিজ্ঞতাই আমাকে এইভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ দিয়াছিল সন্দেহ নাই। অধ্যাপক মহাশয়ের পরিচিত দুই চারিটি যুবক ও প্রৌঢ় ব্যক্তিও শনিবারের মজলিসে অনেক সময় যোগ দিতেন। শনিবারের রাত্রিটা খুব আমোদেই কাটিত। ব্রাহ্ম পরিবারে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা আমার জীবনে ইহাই প্রথম। স্ত্রীজাতির সঙ্গে আমার মেলামেশার অভিজ্ঞতা—একদিকে গ্রামের অশিক্ষিতা বা সামান্য শিক্ষিতা এবং প্রাচীন আওতার কোণে বর্ধিতা মা খুড়ি জেঠি বৌদিদি ভগ্নী ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রভৃতি কুলললনাগণের মধ্যে, অপরদিকে কুলত্যাগিনী সকল সমাজের বাহিরে অবস্থিতা অভিনেত্রীগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং ইহাদের সহিত আলাপ করিতে আমার প্রথম প্রথম খুবই বাধ বাধ বোধ হইত। অপরাপর আলোকপ্রাপ্ত যুবকেরা যেমন নিঃসংকোচে কথা বলিত,—আমি প্রথম প্রথম তেমন পারিতাম না। সর্বদাই মনে হইত, হয়ত এমন কিছু বলিয়া ফেলিব, অথবা এমন কোন ব্যবহার করিয়া বসিব যাহাতে ইহারা আমাকে একেবারে অসভ্য মনে করিবে। লীলা আমার এই সংকোচের ভাব বুঝিতে পারিত এবং বেশ একটু আমোদ অনুভব করিত।

এই ভাবে প্রায় মাসখানেক অতীত হইবার পর একদিন অধ্যাপক পত্নী আমাকে বলিলেন—"রমেশ, তোমার পড়াশুনার যদি বিশেষ ক্ষতি না হয় তা হলে তুমি লীলাকে একটু গান শেখালে আমরা খুব খুশি হব।"

আমি উৎসাহের সঙ্গে সেই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম এবং বলিলাম যে অধ্যাপক মহাশয় যদি মত করেন তা হলে আমার কোনো আপত্তি নাই। অধ্যাপক মহাশয় কোন আপত্তি করিলেন না। আমি লীলাকে গান শিখাইতে আরম্ভ করিলাম। সন্ধ্যার সময় ঘণ্টাখানেক নিজের পড়া বুঝিয়া লইতাম, তারপর ড্রয়িং রুমে এক ঘণ্টা লীলাকে গান শিখাইতাম। লীলাকে গান শিখাইতে আমার বেশি বেগ পাইতে হয় নাই। যে কোন কঠিন সুর আয়ত্ত

করিবার ক্ষমতা তাহার বেশই ছিল ; কিন্তু বিপদ হইল "তাল" লইয়া ; সুরকে তালের গণ্ডিতে বাঁধিতে যে সূক্ষ্ম হিসাবের প্রয়োজন হয় তাহা লীলাকে আয়ত্ত করাইতে আমার খুব বেগ পাইতে হইয়াছিল।

এই গান শিখাইবার উপলক্ষে লীলার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। গান শিখাইবার সময় অধ্যাপক মহাশয় ও অধ্যাপকপত্নী প্রথম প্রথম উপস্থিত থাকিতেন, পরে অনেক দিন থাকিতেনও না। ভাল ভাল গানই আমি লীলাকে ক্রমে ক্রমে শিখাইতেছিলাম। এই সময় লীলার অনেক বন্ধু -পরিবারেও সান্ধ্য সম্মিলনে আমার নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল এবং সেই সকল মজলিসেও আমি গান গাহিতে লাগিলাম। অনেক আলোক ও প্রগতিপ্রাপ্তা মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় হইল। প্রতি রবিবার বৈকালে অধ্যাপক মহাশয়ের সঙ্গে সমাজেও যাইতে আরম্ভ করিলাম। উপাসনার শেষে অধ্যাপক মহাশয়ের সঙ্গে গভীরভাবে সেই দিনের বক্তৃতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতাম। এমন ভাব দেখাইতাম, যেন আমি প্রচলিত হিন্দুধর্মের কুসংস্কারাপন্ন আচার ব্যবহারের প্রতি ক্রমশ বিতৃষ্ণ এবং ব্রাহ্ম সমজের আচার ব্যবহারের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছি। আমি বাছা বাছা ব্রহ্মসংগীতগুলি যত্ন করিয়া গোপনে শিখিতে লাগিলাম এবং কতকগুলি সংগীতে প্রচলিত সুর একটু পরিবর্তন করিয়া তাহাতে একটু নূতন শ্রুতিমধুর ঢং লাগাইয়া গাহিতে লাগিলাম। তাহার ফলে যাঁহারা এ-সব গানে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁহারাও আমার নিকট একটা নূতন কিছু শিখিবার প্রলোভনে আমার সহিত মেলা মেশা করিতে লাগিলেন।

এইভাবে আমার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল বটে, কিন্তু আমি যে উদ্দেশ্য লইয়া গিয়াছিলাম সেই উদ্দেশ্যের সফলতার পক্ষে বিশেষ কিছু অগ্রসর হইতে পারিলাম না। লীলার সরল সহজ নিঃসংকোচ ব্যবহারই যেন আমাকে দূরে রাখিতে লাগিল। আমি তাহার মধ্যে এমন কিছু দেখিতে পাইলাম না যাহাতে আমি তাহার নিকট কোন প্রকার অসৎ প্রস্তাব করিতে পারি। অথচ দিন দিন লীলার সান্নিধ্য এবং রূপ আমার বাসনার অনলে ইন্ধন যোগাইয়া আমাকে যেন পাগল করিয়া তুলিল। কেবল লীলা নহে, যে সকল আলোক ও প্রগতিপ্রাপ্তা মহিলার সঙ্গে আমি মিশিতে পারিয়াছিলাম তাহাদের অনেকের সৌন্দর্যই আমার প্রাণে ওই প্রকার লালসার সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে 'বাঁশ বনে ডোম কানা' যাহাকে বলে আমার দশা অনেকটা তাহাই হইয়াছিল।

এই সময় শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় হয়। কেন যেন আমাকে তিনি বিশেষ ভাল চোখে দেখেন নাই। হিতবাদী সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ[১১] মহাশয়ের লিখিত রুচি-বিকার কবিতা লইয়া ইনি তাঁহার নামে যে মানহানির মোকদ্দমা করিয়াছিলেন তাহা আমি কাগজে পড়িয়াছিলাম, অবশ্য তখন আমি স্কুলে পড়ি। সুতরাং তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সময় মনে মনে বেশ একটু কৌতূহল অনুভব করিয়াছিলাম। হেরম্ববাবু অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতির লোক। তাঁহার মুখে হাসি কদাচ দেখিয়াছি মনে হয় না।

হেরম্ববাবু আমাকে বিশেষ পছন্দ করিতেন না এবং আমার অধ্যাপক মহাশয়কে তিনি বলিয়াছিলেন যে তাঁহাদের সমাজের বাহিরের একটি যুবককে এমন ঘনিষ্ঠভাবে সমাজের মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করিতে দেওয়া মঙ্গল হইতেছে না।

যাহা হউক হেরম্ববাবুর আপত্তি টেঁকে নাই। আমি অবাধে সর্বত্র মেলামেশা করিতে লাগিলাম। একথা বলা প্রয়োজন যে, অধ্যাপক মহাশয়কে আমি প্রথম এক মাস পঞ্চাশ টাকা দিয়াছিলাম। তাহার পরের মাসে টাকা দিতে গেলে, তিনি সে টাকা গ্রহণ করেন নাই। আমি লীলাকে গান শিখাইতাম সুতরাং তিনি আমার নিকট কোন টাকা লইতে পারেন না, এই অজুহাতে আমার টাকা ফেরত দিয়াছিলেন।

ইহার মধ্যে একদিন অধ্যাপক মহাশয় আমাকে বলিলেন—"রমেশ, পরশু লীলার জন্মতিথি উৎসব, আমার কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবকে সেদিন আহ্বান করিব। তুমিও সেদিন রাত্রে এখানে খাবে, আর অভ্যাগতদের cnteratin করতেও (আমোদ দিতে) তোমাকে চাই।"

সাগ্রহে তাঁহার কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। তখনই মনে হইল লীলাকে জন্মতিথি উপলক্ষ্যে একটা কিছু উপহার দিতে হইবে। গুণেন্দ্র বলিল—"নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত। মাস মাস পঞ্চাশ টাকা করে যা দেওয়ার কথা ছিল, তা দিলে এত দিনে [য] প্রায় তিনশত টাকা তোকে দিতে হ'তো সে টাকাটা বেঁচে গেছে। একশ দেড়শো টাকা দামের ভেতর একটা সোনার অলঙ্কার কিনে দে।"

তারপর দিন আমি ও গুণেন্দ্র রাধাবাজারের একটি দোকান হইতে একটি সুদৃশ্য নেকলেস খরিদ করিলাম। দাম আমাদের বরাদ্দ টাকায় কুলাইল না, দুই শত পঁচিশ টাকা লাগিল। নেকলেসের যে ভেলভেট মণ্ডিত কেস ছিল, তাহার উপর সোনার একখানা পাত লাগাইয়া তাহার উপর—

To Lila Devi
On Her Seventeenth Birth-day
Wishing many happy returns of the same.
Ramesh

অর্থাৎ—"লীলাদেবীর সপ্তদশ জন্মতিথিতে এই দিবসের বহু পুনরাগমন কামনা করিয়া রমেশ কর্তৃক এই উপহার প্রদত্ত হইল।" এই কয়েকটি কথা খোদাই করিয়া দিলাম।

লীলার জন্মতিথি উৎসবের দিন নেকলেসের বাকসটি লইয়া খুব সকালে আমি অধ্যাপক মহাশয়ের বাড়িতে গেলাম। লীলার ছোট ভাইয়ের হাতে বাকসটা দিয়া, তাহার দিদিকে দিতে বলিয়া চলিয়া আসিলাম। নিজ হাতে লীলাকে দিতে আমার কেমন একটু বাধ বাধ ঠেকিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমি যখন অধ্যাপক মহাশয়ের বাসায় গিয়া পৌঁছিয়াছি, তখন তাঁহার নিমন্ত্রিত ও নিমন্ত্রিতাগণ আসিয়া জুটিতেছিলেন। লীলা যে সকল উপহার পাইয়াছে তাহা ড্রয়িং রুমে একটা টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। আমার প্রদত্ত উপহার প্রত্যেকেরই দৃষ্টি ও প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছিল। অত মূল্যবান উপহার কেহই লীলাকে দেয় নাই।

আমি কক্ষে প্রবেশ করিতেই অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন—"রমেশ, তুমি ভারি অন্যায় করেছো, এতগুলো টাকা খরচ করে ওই নেকলেসটা কিনলে কি বলে?"

অধ্যাপক পত্নী বলিলেন—"পাগল? এখনো সংসারে ঢোকেনি কিনা, টাকার দরদও তাই বোঝেনি।"

দু'জনেই মৃদু তিরস্কার করিলেন কিন্তু তাঁহাদের সহাস্য মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হন নাই। তিরস্কারের উত্তরে আমি একটু মৃদু হাসিয়া মাথা নত করিলাম মাত্র। তারপর লীলা যেখানে বসিয়াছিল সেই দিকে অগ্রসর হইলাম।

লীলা ও তাহার একটি বন্ধু, উষাদেবী বলিয়া আমি তাঁহাকে উল্লেখ করিব, একটি সোফায় একত্র বসিয়াছিলেন। আমি যাইয়া দু'জনকে নমস্কার করিতেই —উভয়ে প্রতিনমস্কার করিলেন।

উষাদেবীর বয়স লীলা অপেক্ষা দুই এক বৎসর বেশি হইবে। তিনি বিধবা মাতার একমাত্র কন্যা। পিতা ব্যারিস্টারি করিতেন ; তাঁহাদের পার্কস্ট্রীট অঞ্চলে একখানি বাড়ি ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা পূর্বোক্ত বাড়িখানি ভাড়া দিয়া বাঙালি পল্লীতে অল্প ভাড়ায় একখানা বাড়ি লইয়া বাস করিতেছেন। উষাদেবী সুন্দরী এবং সুরসিকা ছিলেন। লীলা তাহার বয়স হিসাবে একটু অতিরিক্ত গম্ভীর ; কিন্তু উষাদেবীর চাল-চলন, কথাবার্তা সবটাতেই বেশ একটা চপলতা সর্বদাই আত্ম-প্রকাশ করিত। আমার সঙ্গেও উষাদেবীর খুব আলাপ ছিল। যে সকল মহিলা আমার হৃদয়রাজ্যে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া পূর্বে বলিয়াছি উষাদেবীও তাহার মধ্যে একজন ছিলেন।

আমাকে দেখিয়া উষাদেবী হাসিয়া লীলার পার্শ্ব হইতে উঠিলেন—এবং পাশে আর একখানি চেয়ার টানিয়া বসিয়া লীলার পাশে সোফার খালি জায়গাটা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন "বসুন বসুন রমেশবাবু—আজ ওই Seat of honour (সম্মানের আসনটা) আপনারই প্রাপ্য"—

আমি একটু অপ্রস্তুত হইলাম। লীলারও গণ্ডদেশ আরক্ত হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম—"আপনি উঠলেন কেন, আপনিই ওখানে বসুন, আমি এই চেয়ারটায় বসছি।"

উষাদেবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ওটা হলো মুখের কথা—মনের কথা নয়, কি বলিস লীলা।"

লীলা বলিল—"বসুন না রমেশ বাবু এখানে, ও কি এক জায়গায় পাঁচ মিনিট বসে থাকতে পারে?"

আমি লীলার পার্শ্বেই বসিলাম। উষাদেবী আমার প্রদত্ত নেকলেস উপহার দেখিয়াই যে ওই প্রকার পরিহাস করিয়াছিলেন তাহা আমি ও লীলা উভয়েই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমি কী বলিব স্থির করিতে পারিতেছিলাম না, কিন্তু লীলার কথায় তৎকালীন situation saved হইল, অর্থাৎ সোজা বাংলায় নাক রক্ষা হইল। উষাদেবী দুইচারিটি কথার পর উঠিয়া কক্ষের অপর পার্শ্বে গেলেন, আমি ও লীলা একত্রে রহিলাম ; তখন লীলা বলিল—"রমেশবাবু আপনি এতগুলি টাকা খরচ করে কেন নেকলেসটা কিনলেন বলুন তো?"

আমি বলিলাম—"তুমি কি সেজন্য অসন্তুষ্ট হয়েছ লীলা?" লীলা মাথা হেঁট করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। আমি তখন বলিলাম—"আমাকে তোমরা পর মনে কর লীলা? তোমার জন্মদিনে তোমাকে একটা উপহার দেবার অধিকারও কি আমার নেই?"

লীলা বলিল—" না না রমেশবাবু, আমি তা বলিনি, উপহার তো অনেকেই দিয়েছে কিন্তু অত টাকা দামের—"

আমি বলিলাম—"ছাই দামের, তোমার গলায় ওই সাধারণ হার কি মানায় লীলা? ওর দশগুণ দাম দিয়ে যদি একটা কিনে আনতে পারতেম তা হলেও আমার কতকটা তৃপ্তি হতো।"

গাঢ়স্বরে কথা কয়টি বলিতে বলিতে আমি লীলার চোখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া দেখিলাম, তাহার গাল দুটি লাল হইয়া গিয়াছে। নিকটে কেহ ছিল না। আমি খপ করিয়া তাহার হাত দুটি ধরিয়া বলিলাম—"বল লীলা—তুমি রাগ করনি!"

লীলা চকিতে আমার দিকে একুট চাহিল ; একটু মৃদু হাসিতে তাহার ওষ্ঠাধর রঞ্জিত হইয়া উঠিল ; তারপর বলিল—"না"।

এমন সময় কক্ষে অপর দিক হইতে অধ্যাপক মহাশয় আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন শুনিয়া আমি উঠিয়া গেলাম। তখন অতিথিদের মধ্যে অনেকেই আসিয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয় আমাকে গান গাহিতে বলিলেন। আমি অরগ্যানের নিকট গেলাম এবং এই গানটা গাহিলাম—

"তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্তসুদুর, আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য গগন-বিহারী।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি বরণ, [রচনা]'
তুমি আমারি-যে তুমি আমারি
মম অসীম গহন-বিহারী।"

আমার গান আরম্ভ হইবামাত্র কক্ষের চতুর্দিক হইতে অনেকে অরগ্যানের নিকটে আসিয়া বসিলেন। লীলা এবং উষাও আসিল। গান গাহিতে গাহিতে যখন গানের শেষ 'কলি'—'মম সংগীত তব অঙ্গে অঙ্গে দিয়াছি [দিয়েছি] জড়ায়ে জড়ায়ে, তুমি আমারি-যে

তুমি আমারি, মম জীবনমরণবিহারী'—গাহিতেছিলাম, তখন অন্যের অলক্ষ্যে আমি লীলার দিকে তাকাইলাম, দেখিলাম লীলাও আমার দিকে চাহিয়া আছে। চোখে চোখ পরিতেই লীলা মুখ ফিরাইল। আমিও মুখ নত করিলাম। আমাদের এই জনান্তিক অভিনয় অন্য কাহারও চোখে পড়িল না বলিয়াই আমরা ভাবিয়াছিলাম ; কিন্তু লীলার পার্শ্বে উষার চক্ষু যে আমরা এড়াইতে পারি নাই, তাহা পরে বুঝিয়াছিলাম।

আমার গান শেষ হওয়ার পর উষা গান গাহিল, লীলা এবং অন্য দুই চার জনও গাহিলেন। উষার গান শেষ হওয়ার পর যখন লীলা গান গাহিতেছিল, তখন একদিকে একটি সোফায় গিয়া বসিয়া উষা আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। আমি নিকটে যাইয়া একখানা চেয়ার লইয়া বসিলাম। উষা আমার দিকে বক্র কটাক্ষে চাহিয়া একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"তারপর রমেশ বাবু—কবে propsoe (বিবাহের প্রস্তাব) কচ্ছেন?"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"Proposc ! সে কি?"

উষা একটু হাসিয়া বলিল—"আকাশ থেকে পড়লেন যে? আমরা কিছু বুঝিনে, কেমন? এই যে আড়াইশো টাকা দামের হার উপহার, এই যে "তুমি আমারি" গাইতে গাইতে সপ্রেম দৃষ্টি বিনিময়, এ থেকে কি অনুমান করা যেতে পারে! আর ঢাক্‌লে চলছে না রমেশবাবু!"

আমি একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিলাম, কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলাম—"উষা দেবী! বৈদান্তিকেরা রজ্জুতে সর্পভ্রম বলে একটা কথা ব্যবহার করেন, আপনার ঠিক তাই হয়েছে। লীলাকে হার দেওয়ার মানে আমি তার প্রেমে পড়িনি, তাঁর বাপ আমাকে রোজ পড়ান, কোন বেতন নেন না ; আমি এই জিনিসটা লীলাকে দিয়ে তিনি আমাকে যে obligation-এ রেখেছেন (উপকার করেছেন) তারই সামান্য প্রতিদান দিয়েছি মাত্র।"

উষা এভাবে কথাটাকে চিন্তা করে নাই, সুতরাং আমি যে কারণ দেখাইলাম তাহা সে উড়াইয়া দিতে পারিল না এবং অবিশ্বাস যোগ্যও মনে করিতে পারিল না। কিন্তু সে সহজে ছাড়িবার পাত্র ছিল না, বলিল—"তা যেন হলো কিন্তু "তুমি আমারি তুমি আমারি' অমন প্রাণ ঢেলে দিয়ে গান আর লুকিয়ে লুকিয়ে চাউনি সেটা কোন obligation-এর প্রতিদান"?

আমার মাথায় চট করিয়া একটা দুষ্ট বুদ্ধি গজাইল, আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম—"উষাদেবী সত্যই শুনতে চান আমার মনের কথা?"

উষা বলিল—"যদি অনুগ্রহ করে বলেন—"

আমি বলিলাম—"ত হলে প্রথমত প্রতিশ্রুত হোন, আমি যা বলি তা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, তাহাতে আমার উপর আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না ; আর আমাদের মধ্যে এখন যে সরল সহজ বন্ধুভাব আছে আপনি সেটা কেড়ে নেবেন না।"

উষা একটু চমকিত হইল, তারপর বলিল—"না না আমাদের বন্ধুভাব নষ্ট হবে কেন? বলুন না কি বলিতে চান।"

আমি আস্তে আস্তে বলিলাম—"আপনি মনে কচ্ছেন, আমার গান লীলাকে উদ্দেশ্য করে গাওয়া হচ্ছিল, তার কারণ গান গাইতে গাইতে আমি লীলার দিকে তাকিয়েছি। কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে লীলার সঙ্গে একাসনে তার একটি বন্ধুও বসেছিলেন, আমার দৃষ্টিটা লীলার দিকে কি তার বন্ধুটির দিকে ছিল, সেটা বিশেষ লক্ষ্য করে দেখেছিলেন কি?"

উষার সারাটা মুখ লাল হইয়া উঠিল। লীলার সঙ্গে একাসনে সেই বসিয়াছিল, সুতরাং আমার কথার অর্থ বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। লীলার প্রতি আমার অনুরাগ সে যে একটু ঈর্ষার চোখেই দেখিতেছে এবং আমার তরফ হইতে পাওয়া ক্ষীণতম আহ্বানও যে সে উপেক্ষা করিতে পারিবে না, একথা বুঝিয়াছিলাম বলিয়াই সে প্রথমত কোন উত্তর দিল না। মাথা হেঁট করিয়া দাঁত দিয়া ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি কামড়াইতে লাগিল। তাহার বাম হাতখানি এক পাশে পড়িয়াছিল, আমি আস্তে আস্তে তাহা ধরিয়া বলিলাম—'উষা! আমি কি খুব অন্যায় কাজ করেছি? আমার যে স্বপ্ন রবিবাবুর ওই গানখানাতে ভাষা পেয়েছে সে স্বপ্ন কি কোনদিন সফল হবে? সত্যি সত্যি "তুমি আমারি" একথা বলবার অধিকার কি তুমি আমাকে কোন দিন দেবে?"

উষা বলিল—"বড্ড গরম, চলুন রমেশবাবু বারান্দায় যাই"। নিজের সাহসে আমি নিজেই অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। ধীরে ধীরে উষার পিছনে বারান্দায় এক কোনে যাইতেই উষা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"রমেশবাবু আপনি যে বল্লেন, এটা কি সত্যই আপনার মনের কথা, না আমি আপনাকে ঠাট্টা করেছিলুম বলে তার পালটা জবাব দিলেন।"

আমি একটু অভিমানের সুরে বলিলাম—'উষা। আমার বিশ্বাস ছিল মনের কথা আর মুখের কথার ভেতর যে পার্থক্য আছে তুমি সেটা সহজেই বুঝতে পারবে।"

উষা কিছু না বলিয়া মাথা হেঁট করিল, আমি আস্তে আস্তে তাহার কটিদেশ জড়াইয়া ধরিয়া বসিলাম—উষা হাসিয়া আমার বুকে মাথা লুকাইল। আমি তাহার ওষ্ঠাধরে আমার প্রণয়ের চিহ্ন মুদ্রিত করয়া দিলাম, সেও তাহার প্রতিদান দিল।

এমন সময় সংগীতধ্বনি থামিয়া গেল, আমরা উভয়ে দুইদিক দিয়া তাড়াতাড়ি গৃহে প্রবেশ করিলাম। তখন উষাকে গান গাহিবার জন্য কয়েকজন অনুরোধ করিলেন। উষা আরগ্যানে যাইয়া বসিল এবং গান ধরিল—

গানখানির শেষ "কলি" উষা যখন গাহিল—

তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়া
জগতে জগতে ফিরিতেছিল কি জাগিয়া?
একি সত্য?

আমার বরণে, নয়নে অধরে অলকে
চিরজনমের বিরাম লভিলে পলকে—
একি সত্য?
মোর সুকুমার ললাট ফলকে লেখা অসীমের তত্ত্ব
হে আমার চির ভক্ত...একি সত্য?

তখন সে সচকিতে আমার দিকে দুই একবার চাহিয়াছিল। উষার কণ্ঠ সকল সময়ই মধুর কিন্তু সেদিন তাহার সুরের মূর্ছনা যেন শ্রোতাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে পশেছিল। আমি তাহার কারণ বুঝিয়াছিলাম। ঐ সংগীতখানিতো আজ তাহার নিকট শুধু ছন্দের বাঁধনে বাঁধা গান নহে, ওই গানখানি যেন সঞ্জীবীত হইয়া উঠিয়াছে। আমি রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি দ্ব্যর্থবাচক গান শিখিয়াছিলাম, উদ্দেশ্য ছিল প্রগতিপ্রাপ্তা যুবতী মহলে গাহিয়া তাহাদের রুচির পরীক্ষা করা। রবীন্দ্রনাথের গান বলিয়া কেহ আপত্তি করিতেন না, কিন্তু উষাও যে এমন গান কণ্ঠস্থ করিয়াছিল তাহা আমি জানিতাম না।

অজস্র প্রশংসাধ্বনির মধ্যে গান শেষ হওয়ার পর জলযোগের ব্যবস্থা হইল। প্রত্যেককে চা কয়েক রকমের মিষ্টি দেওয়া হইল। অতিথিগণ সকলে ক্রমে ক্রমে বিদায় লইলেন। উষাও বিদায় লইল। উষা বিদায় লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও বিদায় লইলাম। উষা যখন গাড়িতে উঠিতেছিল, তখন তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম—"আপনি একলা যাবেন! অনুমতি করেন তো আপনার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।"

উষা বলিল—"বাড়ির গাড়ি রয়েছে, আপনাকে আর কেন কষ্ট দিই!"

অধ্যাপক মহাশয় নীচে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি আমাদের কথা শুনিতে পাইলেন—বলিলেন—"বেশ তো! রমেশ গিয়ে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক, রাত একটু বেশি হয়েছে, একজন সঙ্গে থাকা ভাল।"

উষা আর আপত্তি করিল না, আমি গাড়িতে উঠিলাম। গাড়ি চলিতে লাগিল। গাড়িতে বসিয়া কত কথাই হইল। উষা স্বীকার করিল, যে প্রথম দেখার পর হইতেই আমাকে সে ভালবাসিয়াছে। আমি লীলাকে ভালবাসি মনে করিয়া সে কতদিন ঈর্ষায় জর্জরিত হইয়াছে। আমিও ওই রকম কত কথা বলিলাম। গাড়ি বাড়িতে গিয়া পৌঁছিল। উষার মা বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার পূর্বেও অনেকবার দেখা হইয়াছে। আমি উষাকে পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছি শুনিয়া তিনি আমাকে পৌঁছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন।

বাড়ি আসিয়া অবশিষ্ট রাত্রি আমার ভাল ঘুম হইল না। উষার উত্তপ্ত স্পর্শ যেন আমাকে মাতাল করিয়া তুলিয়াছিল। গুণেন্দ্র সেদিন বাসায় ছিল না। থিয়েটারের একজন সুন্দরী অভিনেত্রীকে লইয়া সে তখন মজিয়াছে। সুতরাং আমার মনের কথা বলিবার কেহ ছিল না।

কেমন করিয়া উষার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং কেমন করিয়া আমার বাসনা পরিতৃপ্তি করিতে পারি, এখন হইতে তাহাই আমার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। লীলার

বাড়িতে যাইবার যেমন লোক দেখান একটা সংগত কারণ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলাম, উষার বাড়িতে যাওয়ার তেমন কোন সংগত কারণ ছিল না। মধ্যে মধ্যে কাহারও বাড়ির সান্ধ্য সম্মিলনে উষার সঙ্গে আমার দেখা হইত এবং পাঁচ সাত দশ মিনিট নির্জনে আলাপের সুবিধা হইত মাত্র।

এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে সুযোগ ঘটিয়া গেল। উষার মা'র অসুখের জন্য ডাক্তারগণ তাঁহার শিমুলতলা, দেওঘর অথবা মধুপুর এই প্রকার কোন স্থানে কিছুদিন থাকিতে বলিতেছিলেন। উষা আমাকে বলিয়াছিল যে অর্থাভাবেই স্থান পরিবর্তন হইতেছে না। কলিকাতার বাসা পাঁচ বৎসরের এগ্রিমেণ্টে তাঁহারা লইয়াছিলেন, সেই বাসার ভাড়া চালাইয়া, আবার স্বতন্ত্র বাসা ভাড়া করিয়া থাকা তাঁহাদের পক্ষে কষ্টকর। ইহার মধ্যে একদিন কথায় কথায় গুণেন্দ্রর নিকট আমি জানিতে পারিলাম—মধুপুরে তাহাদের একখানা বাড়ি আছে। আমি গুণেন্দ্রকে বলিলাম বাড়িটা উষার মা'র জন্য ছাড়িয়া দিতে হইবে। গুণেন্দ্র আমার সব খবরই রাখিত। সে একটু হাসিয়া স্বীকৃত হইল। আমি সেই দিনই বৈকালে উষার বাড়িতে গেলাম। উষা আমাকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল। তাঁহার মাও বিস্মিত হইলেন। করাণ সেই একদিন উষাকে পৌঁছাইয়া দেওয়া ভিন্ন আমি তাঁহাদের বাড়িতে আর যাই নাই, যদিও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের গৃহে প্রায়ই দেখা হইত। উষার মা আমাকে আদর করিয়া বসাইলেন এবং উষাকে চা আনিতে বলিলেন। অন্যান্য কথার পর চা খাইতে খাইতে আমি উষার মাকে বলিলাম—"আপনি খুব অসুস্থ, ডাক্তার আপনাকে চেঞ্জে যেতে বলেছেন, কিন্তু আপনি যেতে দেরি কচ্ছেন কেন?"

উষার মা আমার মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন—পরে বলিলেন—"অনেক কারণ আছে বাবা, যাবার উপায় থাকলে কি আর না যেতাম!"

আমি বলিলাম—"আমার অপরাধ নেবেন না, আমি বুঝতে পেরেছি যে Financial difficultyর (অর্থঘটিত অসুবিধার) জন্যই আপনি যেতে পাচ্ছেন না—কেমন তাই নয়?"

আমার এই প্রশ্নে উষার মা একটু বিস্মিত হইলেন। কারণ এ রকম প্রশ্নটা একটু ভদ্রতা বিরুদ্ধ। কিন্তু আমি যে কেবল কুতূহলের বশবর্তী হইয়া কথাটা জিজ্ঞাসা করি নাই তাহাও তিনি আমার মুখের ভাব হইতে বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন—"হ্যাঁ বাবা—একটা কারণ তাও বটে।"

আমি বলিলাম—"মধুপুরে আমার একটি বন্ধুর একখানা সুন্দর বাড়ি আছে। বারমাস খালি পড়ে থাকে, আমি সেই বাড়িখানা আপনার জন্য চেয়ে নিয়েছি। দু'চার মাস যা দরকার হয় আপনি সেখানে স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পারেন। বাসায় মালি দরোয়ান আছে, কোন অসুবিধা হবে না। তিনি বাড়ি ভাড়া দেন না, আবশ্যক হলে বন্ধু-বান্ধবকে থাকতে দেন।"

উষার মা একবারে অবাক হইয়া গেলেন—বলিলেন—'তুমি আমাদের জন্য এত কচ্ছ কেন বাবা।"

আমি বলিলাম—"এ আর এত কি কল্লেম। আমি উষা দেবীর কাছে একদিন কথায়

কথায় শুনেছিলুম যে ডাক্তার আপনাকে চেঞ্জে যেতে বলছেন, আপনি দুটো establishment এর খরচ কঠিন বলে যেতে রাজি হচ্ছেন না। আমার বন্ধুর বাড়িটা খালি আছে শুনে আপনার কথা আমার মনে হল, তাই আমি তাঁকে বলেছি। তিনি ঘর দোর পরিষ্কার কর্তে দরোয়ানকে লিখে দিয়েছেন।"

উষার মা হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"কি সর্বনাশ! একেবারে ঘর দোর পরিষ্কার পর্যন্ত শেষ! কি বলিস উষা, এ পাগল ছেলের কাণ্ডটা দেখেছিস্!"

উষা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল—তারপর মাকে বলিল—"বেশ তো মা—চল না দু' এক মাস সেখানে থেকে আসা যাক।"

উষার মা বলিলেন—"তুইতো বলেই খালাস। তোর কলেজের কি হবে? এখানে বাসায় একলা তুই থাকবি কি করে?"

উষা বলিল—"আমিও তোমার সঙ্গে যাব, আমি বুঝি এখানে থাকব!"

উষার মা বলিলেন—"তাকি হয়—তোর একজামিন এসে পড়েছে!"

আমি বলিলাম—"আপনি চলুন, উষাদেবী আপনার সঙ্গে যাবেন, সপ্তাহ খানেক সেখানে থেকে তিনি চলে আসবেন, আপনি সেখানে থাকবেন।"

উষা বলিল—"সেই ভাল মা, তুমি আমাকে সঙ্গে রাখবে, আমি এসে কয়টা দিন এখানে থেকে একজামিন দিয়ে আবার তোমার কাছে যাব।"

উষার মা বলিলেন—"তুই একলা এ বাড়িতে থাকতে পারবি?"

উষা বলিল—"বারে, একলা কেন? রামদীন (দারোয়ান) আছে, ভজুয়া (মালী) আছে, দুখীয়া (মালীর স্ত্রী) রাত্রিতে আমার কাছে থাকবে। ইসমাইল্ (বাবুর্চি) থাকল, তোমার এত ভাবনা কি?"

এরা সকলেই ব্যারিস্টার সাহেবের বহুদিনের পুরাতন চাকর।

আরও কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পর উষার মা যাইতে স্বীকৃত হইলেন এবং আমাকে বলিলেন—"বাবা তোমাকে তাহলে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। আমাকে পৌঁছে দিয়ে উষাকে নিয়ে তুমি ফিরে আসবে, আর ও যে ক'টা দিন একলা থাকবে তুমি মাঝে মাঝে এসে ওকে দেখে যাবে।"

আমি স্বীকৃত হইলাম। কয়েকদিন মধ্যেই সব বন্দোবস্ত করিয়া উষা এবং তাহার মাকে লইয়া যাত্রা করিলাম। গুণেন্দ্র স্টেশনে গিয়াছিল, আমি তাহার সঙ্গে উষা এবং তাহার মার পরিচয় করিয়া দিলাম। উষার মা গুণেন্দ্রকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন। গুণেন্দ্রও যথাযোগ্য উত্তর দিল। গাড়ি ছাড়িবার সময় গুণেন্দ্র আমার কানে কানে বলিল... "Lucky dog"—অর্থাৎ "খুব বরাৎ জোর যে তোর।"

মধুপুরের বাসা দেখিয়া উভয়ে খুব সুখী হইলেন। দিন রাত্রি উষার সঙ্গে একত্র থাকিয়া আমিও স্বর্গসুখ ভোগ করিতে লাগিলাম। উষার মা রাত্রি আটটা সাড়ে আটটার সময়ই আহারাদি করিয়া শুইতে যাইতেন। আমি ও উষা একত্র বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প করিতাম, গান গাহিতাম। আমার এতদিনের সাধ পূর্ণ হইল।

সাতদিনের স্থলে পনেরদিন কাটাইয়া আমি ঊষাকে লইয়া কলিকাতা ফিরিলাম। যাত্রার পূর্ব দিন স্টেশনে আসিয়া রাত্রির গাড়িতে একটি কামরা রিজার্ভ করিয়া গিয়াছিলাম। বাড়িতে তাহা কেহই জানিত না। স্টেশনে আসিয়া ঊষা কামরায় রিজার্ভ টিকিট দেখিয়া হাসিয়া বলিল—"গাড়ি রিজার্ভ করেছ দেখছি।"

আমি বলিলাম—"আজ আমাদের পূর্ণ মিলন-বাসর—আজ আর ভয় নেই।"

গাড়ির চাবি একটা কিনিয়াছিলাম ; গাড়ি ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে চাবি বন্ধ করিয়া দিলাম।

ঊষা কলিকাতায় প্রায় কুড়ি পঁচিশ দিন থাকিয়া পরীক্ষা শেষ হইলে, মধুপুর চলিয়া গেল। এই পঁচিশ দিন প্রায় প্রত্যহ আমি তাহাদের বাড়িতে যাইতাম ; দুখিয়াকে কোন ছুতায় সরাইয়া দিয়া আমরা নানারকম গান ও গল্পগুজব করিতাম।

যে কয়দিন মধুপুরে ছিলাম সেই ক'দিন ভিন্ন প্রতি সন্ধ্যায় অধ্যাপক মহাশয়ের বাড়ি যাওয়া আমার বন্ধ হয় নাই। মধুপুর যাওয়ার সময় অধ্যাপক মহাশয়, তাঁহার স্ত্রী এবং লীলাকে আমি বলিয়াই গিয়াছিলাম যে জন্য যাইতেছি। ঊষার মাও একদিন অধ্যাপক মহাশয়কে বলিয়াছিলেন। আমার অনুগ্রহেই যে তাঁহাদের স্বাস্থ্যলাভের এই সুযোগ ঘটিতেছে একথা বলিয়া আমার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। নিছক পরোপকার প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়াই আমি ঊষাদের জন্য এই ব্যবস্থা করিতেছি, ইহাই সকলে জানিয়াছিল এবং অধ্যাপক মহাশয় ও তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদের পরিবারে এজন্য আমি যথেষ্ট প্রশংসাও প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

যাহা হউক কয়েক মাস পর ঊষার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরও তাহার সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, সুযোগ পাই নাই। সে এখন সমাজে বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারিণী ও সতীসাধ্বী বলিয়া পরিগণ্যা। তাহার প্রকৃত নাম এই গ্রন্থে ব্যবহার করিতে পারিলাম না।

এই সকল আলোকপ্রাপ্ত, বিলাত প্রত্যাগত এবং বিলাত প্রত্যাগতের অনুকরণকারী আধুনিক প্রগতিপ্রাপ্তা পরদা-বিরোধী সমাজের মহিলাগণের সহিত মিশিয়া আমার লাম্পট্য প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার কতগুলি সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। ঊষার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। আর একটি মহিলার অনুগ্রহ লাভ করিতে আমি সমর্থ হইয়াছিলাম। তিনি যাঁহার স্ত্রী, তাঁহার নাম আমি কমলিনীরঞ্জন বলিয়া উল্লেখ করিব। বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে তিনি পরিচিত, পণ্ডিত লোক বলিয়া ইহার খ্যাতি আছে। ইনি কেবল আমাকে অনুগ্রহ করেন নাই, আমাদের দলের অনেকেই ইহার কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছিল। প্রায় দুই বৎসর পূর্বে স্ত্রী ষোড়শী কন্যাকে লইয়া স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার এই কন্যাটিরও বিবাহ হইয়াছিল। কন্যাটি নাকি একটু জ্যোতিষ জানিতেন। জ্যোতিষ গণনায়, ইহার সঙ্গে স্বামীর মিলনে স্বামীর প্রাণহানির সম্ভাবনা জানিতে পারিয়া পতির প্রাণরক্ষার জন্য পাতিব্রত্য ধর্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ইনি স্বামী ত্যাগ করিয়া অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাংলার রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে যে সকল পত্রিকা

প্রকাশিত হইতেছে, তাহার একটি পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট জনৈক ভদ্রলোকের আশ্রয়ে কন্যাটি ছিল, বর্তমানে শিশির ভাদুরীর সঙ্গে এমেরিকা গিয়াছে। (আমরা ওই ভদ্রলোকটিব নাম মহাদেববাবু বলিব) ইনিও আমার মত একটি নরদেবতা। কন্যার মাতা পলায়ন করিয়া আসিয়া প্রথমত কলিকাতা বোর্ডিং-এ কয়েকদিন, তারপর সিটি বোর্ডিং-এ কয়েকদিন, পুনরায় কলিকাতা বোর্ডিং-এ কয়েকদিন থাকিয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া অবশেষে রামবাগানের আস্বাদও গ্রহণ করিয়াছেন। ২৪ বৎসর স্বামীর ঘর করিয়া তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া আজ তৃপ্তির আশায় যাহা করিতেছেন তাহাতেও নাকি তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। গরীবের ঘরে এমন সুন্দরী স্ত্রী খুবই কম দেখা যায়। কবি এবং সাহিত্যিক বন্ধুগণই ইহাকে কুলের বাহির হইতে প্ররোচিত করিয়াছিল। কমলিনীবাবু 'মনোরমা' স্ত্রীর আশা এখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি জানেন না যে 'পরিমল' গন্ধে কেবল অলি নহে, পশুও জুটিয়াছে। কবি ও সাহিত্যিক বন্ধুদিগকে তিনি নিজেই স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিয়া বাঙালির কুসংস্কার দূর করিতে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। স্ত্রী ও কন্যার কোন রাজবাড়িতেও যাতায়াত ছিল বলিয়া শুনা যায়—অবশ্য কমলিনীবাবু নিজেই সেখানে পরিচয় করিয়া দিয়া থাকিবেন। দুইজন বাংলা কাগজের সম্পাদক ইহাদের সারথী ছিল।

মনোরমা* গড়িয়াহাটার কোন শখের থিয়েটারে মাঝে মাঝে অভিনয় করিয়া থাকেন। ফিল্মের অভিনেতৃর ব্যবসা অবলম্বন করিবার জন্য তিনি বিখ্যাত অভিনেতা চারু রায় মহাশয়ের নিকট যাতায়াত করিতেন। কন্যা পরিমল বিখ্যাত অভিনেতা শিশির ভাদুড়ী মহাশয়ের সঙ্গেই আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন।**

গুণেন্দ্র একদিন বলিল—"কলিকাতা যে আমেরিকা হ'তে চল্‌ল হে!" বলিয়াই সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। আমি বলিলাম—"ঘটনাটা কি খুলেই বল না।" তখন তাহার নিকট যাহা শুনিলাম, তাহা পাঠকগণ হয় ত বিশ্বাসই করিবেন না। গুণেন্দ্র বলিল যে বেহালার নিকট বড়িশার এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবারে অক্ষয় চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার স্ত্রী অসামান্যা সুন্দরী। জোড়াসাঁকোর নিকট তাঁহার স্ত্রী সরলা দেবী এক আত্মীয়ের বাড়ি আসিতেন। এখানে এক 'দত্ত' পদবিধারী উকিলের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। পরিচয় ক্রমে প্রেমে পরিণত হইল। স্বামী এই গুপ্ত প্রেমের বিষয় শুনিলেন। স্বামীও মোটা বেতনে চাকুরি করিতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চাকরি যায়। চাকুরি যাওয়ায় অর্থকষ্ট হয়। তখন স্বামী

---

* এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার অনেক পরে ১৯৩১ সনে মনোরমা কোন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানীর এক অভিযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিচারে প্রমাণিত হইয়াছে যে মনোরমা বর্তমানে ঘৃণীত জীবনযাপন করিতেছেন, এজন্য মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হইয়াছে। ইহার বর্তমান নাম সুদেবী।

** '১৯৩৩-এর সেপ্টেম্বর পরিমল দেবী, প্রভা, কঙ্কাবতীও শিশিরকুমারের সঙ্গে কলকাতা থেকে আমেরিকা যাবার জন্য রওয়ানা হয়েছিলেন।

স্ত্রীকে বলিলেন, "গোপনে এমন প্রেম করিয়া লাভ কি? যাহাতে অর্থ আসে এবং তোমার কামনাও সিদ্ধ হয়—চল তাহাই করি।" স্ত্রী ইহাতে খুব সুখী হইলেন। তাঁহারা সোনাগাছি অঞ্চলে গৌরীশঙ্কর লেনের এক বাড়িতে দুইখানা ঘর ভাড়া নিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। তাহাদের দুইটি ছোট যমজ পুত্র ছিল, ইহাদিগকেও সঙ্গে নিলেন। স্বামী সংসারের কাজকর্ম করিতেন ও ছেলে রাখিতেন। গুণেন্দ্রের কথা আমার বিশ্বাস হইল না, বলিলাম—"আমাকে ওই সরলার নিকট পরিচয় করাইয়া দিতে হবে।" গুণেন্দ্র আমাকে লইয়া তাহার নিকট গেল। আমি যেদিন প্রথম তাহার নিকট গেলাম, সেদিন সাহিত্যিক উকিল সুরেন মুখার্জিকে সেখানে পাইলাম। আমাকে দেখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমি সরলার ঘরে বসিয়া মদ খাইতে লাগিলাম এবং গুণেন্দ্রের কথা সত্য কিনা তাহা পরীক্ষা করিতেছিলাম। গুণেন্দ্র যাহা বলিয়াছিল, সরলাও তাহাই বলিল। রাত্রি তখন প্রায় ১১।।০টা, সরলা বলিল যে ১২টার পর সে অন্য লোক স্থান দেয় না, তখন স্বামীর ঘরে যায়। আমি তো অবাক, বেশ্যার আবার স্বামী কি! প্রশ্ন করিলাম,—"আপনার ওই স্বামী আপনাকে কী দেন এবং কতদিন রখিয়াছেন?" সরলা বলিল—"উনি আমার বিবাহিত স্বামী, দেনাপাওনা আবার কি"! আমি বলিলাম—"তাহাকে রাখিয়া লাভ কি? তাড়াইয়া দিন ওকে।" ইহাতে সরলা বলিল—"আমি এত করা সত্ত্বেও যখন তিনি আমায় ত্যাগ করেন নাই, তখন আমি আর কি করিয়া তাড়াইব?" ক্রমে ইহার স্বামী অক্ষয়বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। এক বৎসর হইল, কলেরায় ইহার স্বামী মারা গিয়াছে। জয় মিত্রের স্ট্রীটে (মাঠের পার্শ্বে) [সেই মাঠে এখন বাড়ি] থাকিবার সময় ইহাদের আর একটি ছেলে হইয়াছে। তিনটি সন্তানের জননী হইলেও তাহার রূপ অটুট ছিল। উকিল দত্ত-মুখার্জি লিমিটেড কোং করিয়া ইহাকে এখন স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছেন। ইহার নিকট এখন ঝুনা সাহিত্যিকের আড্ডা।

কোন সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম, রবিন্‌সন্‌ নামক এক আমেরিকান আপনার স্ত্রীকে কোন ভারতীয় স্বাধীন নৃপতির লালসাভোগের জন্য অর্পণ করিয়া পরে আদালতের সাহায্যে বহু টাকা আদায় করিয়াছিল। কাগজে পড়িয়াই আশ্চর্য হইয়াছিলাম—কিন্তু এই ঘটনা তাহা হইতে আশ্চর্য। কলিকাতা আজগুবি দেশই বটে।

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকজন বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমাকে পরাস্ত হইতে হইয়াছিল তাহারই নিকট যাহাকে পাইবার জন্য আমার প্রথম আগ্রহের সৃষ্টি হওয়ায় আমি এ-দলে প্রবেশ করিয়াছিলাম।

আমি লীলার কথা বলিতেছি। সেদিনের কথা আমার এখনো স্মরণ আছে, যেদিন আমি লীলার নিকট প্রকাশ্য প্রেম জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। লীলার বাড়িতে অধ্যাপক মহাশয় নীচে কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন, অধ্যাপক পত্নী সেদিন অসুস্থ বলিয়া শয়ন ঘরে আবদ্ধ ছিলেন। আমি লীলাকে একটা নূতন গানের সুর শিখাইতে ছিলাম।

লীলা চুপ করিয়া আমার কথা শুনিল, তারপর বলিল,—"রমেশবাবু! আপনি আমাকে

ভালবাসেন এতো আমার সৌভাগ্য! কিন্তু একথা আপনি আমাকে না বল্লেই ভাল করতেন। আপনি হিন্দু, আমি ব্রাহ্ম, আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ হওয়া তো সম্ভব নয়।"

বিবাহের চিন্তা এক মুহূর্তের জন্যও আমার প্রাণে জাগে নাই, সুতরাং আমি থমকিয়া গেলাম কিন্তু একটু পরেই বলিলাম—"লীলা আমি ওসব কথা শুনতে চাই না। আমি শুধু তোমার কাছে জানতে চাই, তুমি আমাকে ভালবাস কি না। আমি যে প্রাণভরা ভালবাসা তোমার পায়ে ঢেলে দিচ্ছি, তার প্রতিদানে তোমার প্রাণেও ভালবাসার একটু উন্মেষ আমি করতে পেরেছি কিনা, এইটি শুধু আমাকে জানিয়ে দাও। অন্য ব্যবস্থার কথা পরে হবে।"

লীলা নতমুখে বলিল—"সে কথা শুনে কি লাভ হবে?"

আমি বলিলাম—"তোমাকে বলতেই হবে। আমি শুনবো।"

লীলা বলিল—"যদি শুনতেই চান তাহ'লে বলছি ; আমিও আপনাকে ভালবাসি। আজ নয় অনেক দিন থেকেই বাসছি কিন্তু"—

আমি বাধা দিয়া লীলার দু'টি হাত দু'হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম—"তবে আর কিন্তু কি লীলা! তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি। হিন্দু ধর্মের বা ব্রাহ্ম ধর্মের লৌকিক কয়েকটা তুচ্ছ আচার আমাদের এই মিলনের মাঝখানে এসে দাঁড়াবে?"

নতমুখী লীলা সহসা উন্নতমুখী হইয়া দাঁড়াইল। তারপর অকম্পিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল,—"আপনি তাহলে কি করতে বলেন?"

মূর্খ আমি! লীলার প্রশ্নের অন্তরালস্থিত তীব্র বিদ্রূপ বুঝিতে পারিলাম না। তাহার দৃষ্টির কঠোরতাও আমার লক্ষ হইল না। ভাবিলাম কেবলমাত্র আমার খুলিয়া বলার অপেক্ষা, তাহা হইলেই অন্য সব কয়েকটির মত লীলাও আমার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিবে। তাই আমি একটু হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"আমি কী করতে বলি? আমার নিজের ভাষায় বলব না, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—

"বীণা ফেলে দিয়ে এস মানসসুন্দরী,
দু'টি রিক্ত হস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি
কণ্ঠে জড়াইয়া দেও......
চুম্বন মাগিব যবে ঈষৎ হাসিয়া
বাঁকায়োনা গ্রীবাখানি ফিরায়োনা মুখ
রেখো ওষ্ঠাধরপুটে ব্যগ্র ভৃঙ্গ তরে
সম্পূর্ণ চুম্বন এক।"

পরমুহূর্তেই লীলার মুখের ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। লীলার চোখ দু'টি হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। লীলা বলিল—"রমেশবাবু, আমি জানিতাম না আপনি এত নীচ! বেরিয়ে যান এখুনি এ বাড়ি থেকে—"

আমি কী যেন বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু আমাকে বাধা দিয়া ক্রুদ্ধা সিংহিনীর মত গ্রীবা বক্র করিয়া লীলা বলিল—"কোন কথা নয়, আমি তা হলে এখনই বাবাকে ডাকব—বেরিয়ে যান—"

বেত্রাহত কুকুরের ন্যায় মাথা নিচু করিয়া আমি সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। পরদিনই যে কলেজে পড়িতাম, সেই কলেজ হইতে ট্রান্সফার লইলাম। পাছে অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হয়, এই ভয়ে সেই হইতে যে সকল পরিবারের সহিত তাহার মেলামেশা ছিল সেই সকল পরিবারের দ্বার আমার পক্ষে রুদ্ধ হইয়া গেল। যদিও জানিতাম লীলা ইচ্ছা করিয়া কথাটা প্রকাশ করিবে না, তথাপি হঠাৎ কোথাও যদি লীলার সঙ্গে দেখা হয় এবং যদি আমার সহিত কথা না বলে, তাহা হইলেও অন্য লোক কি মনে করিবে, ইহা ভাবিয়া আমি নিজেই সেই সমুদয় স্থানে যাওয়া বন্ধ করিলাম।

ইহার পর রীতিমত বেশ্যাসক্ত হইয়া পড়িলাম। গুণেন্দ্র এবং আমি দুইজনে একত্রেই আমোদপ্রমোদ করিতে যাইতাম। তখন কেবল থিয়েটারের অভিনেত্রী নয়, অনেক সুবিখ্যাত এবং অবিখ্যাত বেশ্যার ঘরেই আমাদের গমনাগমন হইতে লাগিল। আমরা তখন একটু একটু মদ্যপানও আরম্ভ করিয়াছি। পূর্বেই গুণেন্দ্রের মাতার মৃত্যু হইয়াছিল। সে তখন একেবারেই স্বাধীন ; সে মেস ছাড়িয়া একটি ছোট বাসা করিয়া ঠাকুর চাকর রাখিল। আমাকে জোর করিয়া তাহার বাসায় লইয়া আসিল। সে পড়াশুনার নাম করিয়া কলিকাতায় থাকিত কিন্তু কলেজে নাম রাখা ভিন্ন সে পড়াশুনার বড় ধার ধারিত না। সে দুইবার বি-এ ফেল করিল। আমি একবার ফেল করিয়া দ্বিতীয়বারে পাশ করিয়া এম-এ পড়িতে লাগিলাম।

আমরা প্রায়ই নিত্য নূতন বেশ্যার বাড়িতে যাইতাম। একদিন আমরা উভয়ে এইভাবে এক বেশ্যার বাড়িতে উপস্থিত হইয়াছি, তাহার নাম কৃষ্ণভামিনী। বেশ্যা হইলেও তাহার চেহারায় একটু ভদ্রভাব ছিল। তাহার বয়স তখন ষোল সতের বৎসর। বেশ্যাজনোচিত হাব ভাবে সে তখনো যেন ভাল করিয়া অভ্যস্থ্ হয় নাই। একটা ম্লান ছায়া যেন তাহার মুখখানিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মেয়েটির ইতিহাস জানিবার জন্য আমার কেমন একটা আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিয়া উঠিল। তাহার প্রতি কেমন আকর্ষণও অনুভব করিলাম। সে দিনের মত আমোদ-প্রমোদ করিয়া চলিয়া আসিলাম।

কৃষ্ণভামিনীর সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়ার কিছুদিন পরে তাহার জীবনের ইতিহাস তাহার নিকট শুনিলাম। ইহা পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

কৃষ্ণভামিনী ব্রাহ্মণের মেয়ে। তাহার পিতার নাম গণেশ গোস্বামী। পিতার বাড়ি ছিল বিখ্যাত তীর্থ তারকেশ্বরের অর্ধ মাইল দূরে, ভঞ্জিপুর, গ্রামে। ওই স্থানের নিকটবর্তী চাঁদুরগ্রামে তিনি ডাক্তারী ব্যবসা করিতেন। ঐ গ্রামের অপর এক পাড়াতে কৃষ্ণভামিনীর মাতামহের বাড়িও ছিল। ত্রিবেণীর নিকট পোলবা গ্রামের রজনী ঘোষাল নামক এক ব্যক্তির সহিত নয় বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পর স্বামীসঙ্গ সে বেশী

দিন ভোগ করিতে পারে নাই। বয়স যখন প্রায় তের কি চৌদ্দ তখন সে বিধবা হয় এবং পিতা তাহাকে স্বামীর গৃহ হইতে লইয়া আসেন।

বিধবা কৃষ্ণভামিনী কখনো পিতার নিকট, কখনো মাতামহীর নিকট বাস করিত। দুই বাড়ির সামান্য ব্যবধানই ছিল। ভঞ্জিপুর গ্রামখানি ছিল তারকেশ্বরের স্বনামধন্য মোহান্ত সতীশচন্দ্র গিরির জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। এই ভঞ্জিপুর গ্রামে কেদার গাঙ্গুলি নামক এক ব্যক্তির বাড়ি নীলামে খরিদ করিয়া সেখানে মোহান্ত তাঁহার হরিমতী নামক এক রক্ষিতাকে রাখিতেন। কৃষ্ণভামিনীর মাতামহের বাড়ি হইতে পাঁচ ছয়খানা বাড়ির পরেই এই বাড়ি। হরিমতীকে লোকে রাণি হরিমতী বলিত। ভঞ্জিপুর গ্রামের ইতর ভদ্র সকল শ্রেণির মেয়েরাই হরিমতীর বাড়িতে বেড়াইতে যাইত। মোহান্ত পাল্কী চড়িয়া দারোয়ান সঙ্গে লইয়া প্রকাশ্য ভাবেই হরিমতীর বাড়িতে যাইতেন। মোহান্তের প্রাসাদের পশ্চিমদিকস্থ্ বাগানের ভিতর দিয়া একটি সোজা রাস্তা ছিল, সেই রাস্তায় প্রাসাদ হইতে হরিমতীর বাড়ি যাইতে পাঁচ সাত মিনিটের বেশি সময় লাগিত না। কৃষ্ণভামিনী হরিমতীকে "পিসিমা" বলিয়া ডাকিত এবং অন্যান্য মেয়েদের ন্যায় তাহার বাড়িতেও যাইত।

একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে কৃষ্ণভামিনী গা ধুইতে যাইতেছে এমন সময় মোহান্তের পাল্কি আসিতেছে দেখিয়া রাস্তায় এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল, মোহান্তের দৃষ্টি হঠাৎ তাহার দিকে পড়িল, মোহান্ত পাল্কি থামাইয়া তাহাকে নিকটে ডাকিয়া তাহার নাম ও পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ভয়ে ভয়ে নাম বলিল। মোহান্ত আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর বেলা প্রায় ২টার সময় হরিমতী কৃষ্ণভামিনীকে তাস খেলিতে ডাকিয়া পাঠাইল। কৃষ্ণভামিনী ও হরিমতী বসিয়া তাস খেলিতেছিল, হঠাৎ মোহান্ত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোহান্ত ঘরে ঢুকিতেই হরিমতী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। হরিমতী বাহির হইয়া যাইতেই মোহান্ত কৃষ্ণভামিনীর হাত চাপিয়া ধরিলেন। কৃষ্ণভামিনী চীৎকার করিয়া হরিমতীকে ডাকিল, কিন্তু হরিমতী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। মোহান্ত সেইখানেই বলপূর্বক তাহার ধর্ম নষ্ট করিলেন। কৃষ্ণভামিনীর সর্বনাশ হইবার পর হাসিতে হাসিতে হরিমতী গৃহে প্রবেশ করিল।

হরিমতী কৃষ্ণভামিনীকে অন্য ঘরে লইয়া গেল এবং তাহাকে নানা প্রকার সান্ত্বনা দিতে লাগিল। কিছু মিষ্টান্নও তাহাকে জোর করিয়া খাওয়াইল। সে তাহাকে বুঝাইল, মোহান্তের ভালবাসা পাওয়া সৌভাগ্যের কথা।

ইহার পর মাঝে মাঝে মোহান্তের হরি নামক একজন খানসামা আসিয়া কৃষ্ণভামিনীকে মোহান্তের বাড়িতে লইয়া যাইত। মোহান্ত তাহাকে নানাপ্রকার অলঙ্কার ইত্যাদি দিবেন বলিয়া প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু একখানা শাড়ি ভিন্ন কিছুই দেন নাই।

হরিমতীর প্রভাব মোহান্তের উপর খুবই ছিল। মোহান্তের অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি সাময়িক আসক্তিতে সে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিত না ; কিন্তু একই স্ত্রীলোকের প্রতি অধিক

দিন মোহান্তের আসক্ত থাকা সে পছন্দ করিত না। কৃষ্ণভামিনীর প্রতি মোহান্তের আসক্তি হইবার রকম দেখিয়াই সে কৃষ্ণভামিনীকে তাড়াইল। কৃষ্ণভামিনীর পিতা এবং গ্রামের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন মোহান্তের ভয়ে কেহই কিছু বলিতে পারিতেন না। মোহান্তের অনুগ্রহ লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের উদ্যত দণ্ড কৃষ্ণভামিনীর পিতা ও মাতামহীর উপর পড়িল। কৃষ্ণভামিনীকে বাধ্য হইয়া গৃহত্যাগ ও জীবিকা নির্বাহের জন্য বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল।

ইহাই সংক্ষেপে কৃষ্ণভামিনীর ইতিহাস। ইতিহাস শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। আমিও লম্পট, আমিও পাপী ; কিন্তু তথাপি এই কাহিনি শুনিয়া আমারও শরীর শিহরিয়া উঠিল। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কুল-ললনার বলপূর্বক সর্বনাশসাধন এবং তাহারই পরিণামে আত্মীয়স্বজনের স্নেহময় কোল হইতে বিচ্যুত হইয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন, যে নররাক্ষসদের অত্যাচারে এই প্রকার ঘটনা সম্ভব হইল সে আজও তীর্থ-গুরুর আসনে বসিয়া পূজা পাইতেছে, ইহা ভাবিয়া ক্রোধে আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। আর মনে মনে সহস্র ধিক্কার দিলাম দাসমনোবৃত্তিযুক্ত সেই সকল সমাজপতিদের, যাহারা এই মোহান্তদের অনুগ্রহ লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই বালিকার উপর এমন নির্মম অত্যাচার করিতে লাগিল।

অবশ্য ভগবানের রাজ্যে অবিচারের প্রতিফল একদিন না একদিন ফলিবে, তাহা তখন না বুঝিলেও আজ বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। মোহান্ত সতীশচন্দ্র গিরির নানাপ্রকার অত্যাচারের কথা লোকমুখে প্রকাশিত হইয়া তারেকেশ্বরে সত্যাগ্রহের সৃষ্টি হয়। তাহার ইতিহাস বাংলার কাহারও জানিতে বাকি নাই। তাহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য হুগলি জজকোর্টে মোকদ্দমা হয়। হুগলির জজ মিঃ কে. পি. নাগ সেই মোকদ্দমায় মোহান্তকে পদচ্যুত করিয়া নূতন মোহান্ত নিয়োগ করিবার এবং একটি কমিটি দ্বারা সমুদয় সম্পত্তি শাসিত হইবার আদেশ দিয়াছেন। সমুদয় সম্পত্তি এমন কি যাহা মোহান্ত তাঁহার ব্যক্তিগত (Personal) বলিয়া দাবি করিয়াছিলেন তাহাও তিনি দেবোত্তর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অর্থশালী মোহান্ত হাইকোর্টে আপীল করিয়াছেন। এ সকল সংবাদ বাংলার পত্র পাঠকগণের অবিদিত নাই।

কৃষ্ণভামিনীর সহিত অনেক দিন আমার দেখাশুনা নাই। কৃষ্ণভামিনী তাহার পর হইতে একজন লোকের রক্ষিতা হিসাবে বাস করিতেছে এবং মোকদ্দমায় সে নাকি সাক্ষ্যও দিয়াছে শুনিয়াছি। এই মোকদ্দমায় মোহান্তের চরিত্র সম্বন্ধে আরও অনেক কেলেঙ্কারি প্রকাশিত হইয়াছে। হরিমতীর গর্ভজাত একটি সন্তান—যাহার নাম কাশীনাথ, তাহাকে তার ভগ্নীপতির পুত্র বলিয়া বাজারে চালাইয়াছে এবং সেই ভগ্নীপতি মহাবীর প্রসাদের নামে আড়া ও বলিয়া জেলায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি খরিদ করিয়া দিয়াছে ; এই প্রকার প্রমাণও উক্ত মোকদ্দমায় নাকি উপস্থিত করা হইয়াছে। হরিমতী এখনও কলিকাতায় স্বতন্ত্র বাড়িতে বাস করিতেছে। মোহান্তের প্রায় সত্তর বৎসর বয়স,

এখনও নাকি তিনি হরিমতীর প্রেমে মশগুল এবং তাহার সমুদয় খরচ বহন ও তথায় গমনাগমন করিয়া থাকেন, ইহাও শুনিতে পাইতেছি।

কৃষ্ণভামিনীর সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘদিন ছিল না। আমরা সুখের পায়রা ছিলাম। নিত্য নূতন উপভোগের আকাঙ্ক্ষাই আমাদের বলবতী ছিল। এই সময় কলিকাতায় আরও দু'চারটি বড় লোকের ছেলের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তাঁহারাও আমাদের মতন কাপ্তেন ছিলেন এবং তাঁহাদের কাহারও কাহারও কলিকাতার নিকটে বাগানবাড়ি ছিল। সেই সকল বাগানবাড়িতে মাঝে মাঝে আমোদ করিতে যাইতাম। বাবুগণ, বাবুদের স্তাবকবৃন্দ, কতকগুলি সুন্দরী বেশ্যা, বাক্স বাক্স বিলাতি মদ এবং নানাপ্রকার আহার্য সেখানে যাইত, কোন সময় ক্রমাগত দুই তিন রাত্রি সেখানে হর্‌রা চলিত।

বন্ধুবর্গের আহ্বানে আমি ও গুণেন্দ্র মাঝে মাঝে এই সকল বাগান পার্টিতে যোগ দিতাম। একদিন গুণেন্দ্র আমাকে বলিল—"দেখ, রমেশ, আমরা তো প্রায়ই বাগান পার্টিতে নিমন্ত্রণ পাচ্ছি, কিন্তু আমরা একদিনও তাদের নেমন্তন্ন করিনি, এটা ভারী লজ্জার কথা নয়!"

আমি বলিলাম—"তোর বাগান কোথায় যে তুই পার্টি দিবি।" গুণেন্দ্র বলিল—"একটা বাগান ভাড়া নিয়ে বা কারুর কাছে যেচে নিয়ে একদিন একটা পার্টি দিতে হচ্ছে, নইলে লোকে ভারী নিন্দে কর্‌বে—"

আমি বলিলাম—"তা তো বুঝতে পাচ্ছি, কিন্তু একটু ভাল করে করতে গেলে দেড়টি হাজার টাকা লাগবে।"

গুণেন্দ্র বলিল—"কুছ্ পরোয়া নেই, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।"

একটি বাগান বাড়ি চাহিতেই পাওয়া গেল। আমাদের দলের একজন সেই বাগানবাড়ির মালিক। একটা বাগানের অভাবে আমাদের এই মহৎ (?) উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না জানিয়া তিনি তাঁহার বাগানবাড়ি আমাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।

গার্ডেনপার্টিতে আমাদের বহু বন্ধু নিমন্ত্রিত হইলেন। পূর্বেই স্থির হইয়াছিল যে, প্রত্যেকেই দু'টি একটি অবিদ্যা সঙ্গে আনিবেন। এতদ্ব্যতীত host (অতিথি সৎকারক) হিসাবে আমরা বাছা বাছা জন কয়েক বেশ্যা, যাহারা ভাল গাইতে ও নাচিতে পারে তাহাদিগকে নিয়াছিলাম। হুইস্কি ও ব্র্যাণ্ডি এবং সোডা প্রচুর পরিমাণে লওয়া হইয়াছিল। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে আমি ও গুণেন্দ্র যদিও মদ খাইতাম, কিন্তু কখনও তেমন মাতাল হইতাম না। সামান্য গোলাপি নেশা করিয়া আর সকলে অতিরিক্ত নেশায় যে সকল অপূর্ব কীর্তি করিত, তাহা সজ্ঞানে দর্শন এবং উপভোগ করিতেই আমরা বেশি আমোদ পাইতাম।

বিকাল বেলা হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যার মধ্যেই বন্ধুবান্ধব এবং অবিদ্যাগণ সকলেই আসিয়া জুটিলেন। সেদিন চতুর্দশী কি পূর্ণিমা ছিল। রাত্রি জ্যোছ্নাময়ী। খাওয়ার জন্য

পোলাও-মাংস চপ-কাটলেট প্রভৃতির আয়োজন করা হইয়াছিল। প্রকাণ্ড হলের মধ্যে শতরঞ্চের উপরে চাদর পাতিয়া সকলে উপবেশন করিলেন, খানসামা কয়েকটা ডিকেণ্টারে তরল লোহিত সুরা আনিয়া দিয়া গেল, কতকগুলি সোডা আসিল। রন্ধনশালা হইতে কয়েকখানা প্লেট বোঝাই হইয়া চপ-কাটলেট প্রভৃতি আসিল। একটা ট্রেতে তবক দেওয়া পানের খিলি এবং কতকগুলি সিগারেট আসিল। যথারীতি উপচারে সুরাদেবীর অর্চনা আরম্ভ হইয়া গেল।

দশ বারো জন্য বাবু এবং পনের ষোল জন বেশ্যা, এতদ্ব্যতীত তবলাওয়ালা, হারমনিয়ম, মন্দিরা বাদক প্রভৃতি কয়েকজন ছিল।

গৃহস্বামী আমি ও গুণেন্দ্র প্রথমে সোডা মিশাইয়া এক এক গ্লাস মদ অতিথিগণকে স্বহস্তে প্রদান করিলাম।—কে বলে বাঙালি জাতি স্ত্রীলোকের সম্মান জানে না। যেভাবে বাবুরা উপস্থিত অবিদ্যাগণকে প্রথমত প্রসাদ করিয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং তাহাদের মৃদু হাস্যরঞ্জিত অধর সংস্পর্শে পবিত্রীকৃত সুরা পান করিলেন, তাহা দেখিলে এই দুর্নাম কেহই করিতে পারিতেন না।

গানের হুকুম হইল। এদিকে মদ্যপান চলিতে লাগিল। সুবেশী সুকণ্ঠি গায়িকাগণের গান আরম্ভ হইল। গানের ফাঁকে ফাঁকে নানাপ্রকার গল্পগুজব চলিতে লাগিল। উহার সবগুলিই অবশ্য কালোপযোগী।

একজন ইহার মধ্যেই একটু মাতাল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি পার্শ্ববর্তী একজনকে চুম্বন করিলেন। আর একজন বলিল—"এই বেয়াদপ—এত লোকের সামনে লজ্জাশীলতার হানি, দাঁড়া তোকে পুলিশে দিচ্ছি।" লোকটি জড়িতকণ্ঠে বলিল—"ঠিক বলেছিস্ বাবা। ওই এত লোকের সামনেই যা দোষ, লুকিয়ে করলে কোন দোষ নেই, নইলে আমাদের পাড়ার শালা কবিরাজের এত মাতব্বরি থাকতো না।"

আর একজন জিজ্ঞাসা করিল—"সে কিরে, ব্যাপার কি?—কবিরাজ তো খুব ভাল মানুষ বলেই জানি!" লোকটি ব্যঙ্গ সুরে উত্তর দিল—"ভাল মানুষইতো বটে বাবা। ডুব দিয়ে জল খেলে একাদশীর বাবাও জানতে পারে না। পাটের বেইলারের বিধবা স্ত্রীকে তোমরা জান কি? লোকটি যাহার নাম করিল তাহা শুনিয়া আমরা চমকিয়া উঠিলাম। আর একজন বলিল—"তুই বলিস কি? অবাক কল্লি যে?"

লোকটি হাসিতে হাসিতে বলিল—"ওই তো মজারে ভাই। চোর ধরা পড়েছি আমরা কয় শালা, আমরা মদ খাই সেটা বড় দোষ, আর সে শালা কি করে জানিস? সে খায় সঞ্জীবনী সুধা, আবার বাবাঠাকুর আর মাঠাকুরুণের নিষ্ঠাটুকুও বেশ আছে। জোড়ায় জোড়ায় রোজ গঙ্গাস্নান করেন।

সকলে হাসিয়া উঠিল। আর একজন একদিকে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে মদ খাইতেছিল, সে এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই, "সে বলিল—ঠিক বলেছিস্ ভাই। শালারা বলে ইংরেজি পড়ে নাকি আমরা বয়ে গেছি। আর ওই যে ব্যাটা...পণ্ডিত আমাদের পাড়ার—সেই

ছোটজাতের মেয়েকে নিয়ে কি ঢলাঢলিটাই না চালাচ্ছে। ছোটজাতের হাতে ভাত খেলে জাত যায়, আর তাদের মেয়েছেলে নিয়ে থাকলে জাত যায় না, শালাদের বেড়ে শাস্তর—"

ইনি যে ব্যক্তির কথা বলিলেন তিনি বর্তমান সময়ে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত। সেই শূদ্রানী এখনো তাঁহার রক্ষিতা আছে বলিয়া জানিয়াছি। তাঁহার ছাত্রেরা সেই স্ত্রীলোকটিকে 'গুরুমা' বলিয়া ডাকিতে বাধ্য হয়—প্রতিবৎসর তাহাকে লইয়া পণ্ডিত মহাশয় নবদ্বীপ যাইয়া পুণ্যসঞ্চয় করিয়া আসেন।

বলা বাহুল্য এই সকল আলাপ সকলেরই বেশ শ্রুতিমধুর হইতেছিল। একজন বলিল—"আরে জোঁকের গায় জোঁক লাগে শুনেছিস্ কখনো।" একজন উত্তর দিল, "খুলেই বলনা।' সে বলিল—"ডাক্তার ভারসাস্ ডাক্তার, এক ডাক্তারের গিন্নির সঙ্গে আর এক ডাক্তার। আমরা সকলেই প্রশ্ন করিলাম—"ব্যাপারটা কি?"

সে উত্তর দিল—"চন্দ্রমাধব" ডাক্তারের স্ত্রীর সঙ্গে "কৃষ্ণমাণিক্য," ডাক্তার জুটে গেছে জানিস্ না। বেচারা চন্দ্রমাধব কিছুই বলতেও পারে না, সইতেও পারে না।"

আর একজন বলিল—"কৃষ্ণমাণিক্য তো পেয়াদাপুরের রাণির চিকিৎসকও হয়েছিলেন জানি। সেই যে স্বাধীন জেনানা।"

প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলিল—"একটিতে কি তার মত লোকের পোষায়, এক "কৃষ্ণ" সহস্র গোপিনী নইলে কি করে চলে?"

একজন বলিল—"কৃষ্ণমাণিক্যের মেয়েটাও যে আবার 'চন্দ্র' তিলক পরছে।" একজন আলোকপ্রাপ্ত ভ্রাতা তখন বলিলেন—"আমাদের সমাজের কুৎসা করোনা—আমাদের সমাজে এমন দুষ্ট লোক থাকিতে পারে না।"

উত্তরে অনেকে বলিলেন—"বেড়ে সমাজতো ভাই, দুনিয়ায় এমন জাত নেই, যে সমাজের মেয়ে দুষ্ট বা বেশ্যা নাই। তবে তোমাদের দেখছি ভারি মজা।"

আবার একটা হাসির হর্‌রা উঠিল। আমরা এই আখ্যায়িকায় ছদ্মনাম ব্যবহার করিলাম বটে কিন্তু এই দুই ডাক্তার এবং এই রানির ঘটনা যে প্রকৃত, তাহাও আমি অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম। ক্রমে ক্রমে সকলেরই অবস্থা সঙিন হইতে লাগিল। হলঘরের পার্শ্বে ছোট ছোট যে সকল কক্ষ ছিল মধ্যে মধ্যে উঠিয়া কেহ কেহ সেই সকল কক্ষে আনাগোনা করিতে লাগিলেন। কোন কোন রসিক আবার অতর্কিতে সেই সময় গৃহে প্রবেশ করিয়া নূতন রসের সৃষ্টি করিলেন।

এই মজলিসে একজন উপস্থিত ছিলেন তাঁহার নাম পদ্মরঞ্জন সরকার। ইনি আমারই একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তখন তিনি সামান্য বেতনে চাকুরি করিতেন। বর্তমান সময়ে অবশ্য তিনি নয়জনের একজন। বাংলায় তাঁহাকে না চেনে এমন লোক খুব কম। ইহার জীবনকথা স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে বলিব ইচ্ছা আছে। ইনি তখন বেশ মাতাল হইয়াছেন, মাতাল হইয়া অপর একজনকে লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন। সেই ব্যক্তিও

মাতাল হইয়াছিল। দুজনে প্রায় মারামারির উদ্যোগ হইল। আমরা মাঝে পড়িয়া ছাড়াইয়া দিলাম।

তখন বেশ জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। রাত্রি প্রায় এগারটা, আহারের জন্য সকলকে ডাকা হইতেছে। কিন্তু মদ ছাড়িয়া কেহ উঠিতে রাজি নহেন। এমন সময় একজন প্রস্তাব করিল বাগানের পুকুরে যে নৌকা বাঁধা আছে তাহাতে এই জ্যোৎস্নালোকে বেড়ান যাক। কয়েকজন মাতাল, "বাহবা, চমৎকার" বলিয়া তখনই উঠিল, বেশ্যা যাহারা ছিল, তাহারা অনেকে যাইতে রাজি হইল না ; দু' তি নটি মাত্র চলিল। সকলে যাইয়া নৌকায় উঠিয়াছে, এমন সময় পদ্ম সরকার টলিতে টলিতে যাইয়া পুকুরের ধারে দাঁড়াইয়া "বাবা আমাকে তোরা নিলিনে, যাঃ না নিলি শালীরা, আমি তো পদ্মফুল, পুকুরেই ফুটে থাকব" বলিয়া ঝাঁপাইয়া জলে পড়িল এবং হাবুডুবু খাইতে খাইতে নৌকার একদিক ধরিয়া ফেলিল। নৌকাখানি একেই অতিরিক্ত বোঝাই হইয়াছিল, তাহার পর একদিকে পদ্মবাবুর ভার পড়ায় ডুবিয়া গেল। আমি ও গুণেন্দ্র ঘাটেই দাঁড়াইয়াছিলাম। জলে নামিয়া সকলকে টানিয়া উঠাইলাম। সৌভাগ্যক্রমে নৌকা বেশিদূর যায় নাই, জলও কম ছিল, সুতরাং কাহারও প্রাণহানী হইল না। বেশ্যাকয়টি পদ্মবাবুকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে লাগিল। পদ্মবাবু জড়িতস্বরে বলিলেন—"গালাগালি কচ্ছো কেন চাঁদ, নেশা ছুটে গেছে তাই, চল না সব শালীকে"—বলিয়া একটা অকথ্য উক্তি করিলেন। সিক্ত বস্ত্রে সকলকে বাগানবাড়ির বৈঠকখানায় আনান হইল। তারপর আহারের ব্যবস্থা। সকলেই টলিতে টলিতে আহারে চলিলেন। আহার যাহা হইল, তাহা না বলিলেও চলে। কেহ কেহ আসনে বসিয়া নাক ডাকাইতে লাগিলেন, অধিকাংশ বাবুই দু'চার গ্রাস মুখে দিয়া থালার উপরেই "ওয়াক্-ওয়াক্" করিয়া বমি করিতে লাগিলেন। খানসামা কতকগুলি নিযুক্ত ছিল, তাহারা বাবুদের সরাইয়া নিয়া ফরাশে শোয়াইয়া দিল। বেশ্যাগুলিরও প্রায় ওই দশা হইয়াছিল। কেবল ভাড়া করিয়া আনা নাচওয়ালি এবং বাদকগুলি ঠিক ছিল। তাহারাও মদ খাইয়াছিল, কিন্তু বেসামাল হয় নাই। আমি ও গুণেন্দ্র তাহাদের যত্ন করিয়া খাওয়াইলাম। আমরাও খাইলাম। তারপর একবার বন্ধুবর্গের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলাম। সেই প্রকাণ্ড ফরাশের উপর অনেকে বিপর্যস্ত পোশাকে পড়িয়া আছে, অধিকাংশই প্রায় অর্ধ উলঙ্গ, কেহ অজ্ঞান অবস্থাতে ওই ফরাশের উপরই বমি করিতেছেন। কেহ অন্যকে জড়াইয়া ধরিতেছে। আমাদের পদ্মরঞ্জন বাবু পার্শ্বে শায়িত দীর্ঘশ্মশ্রু বিশিষ্ট একটি বাবুকে জড়াইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিতেছিলেন আর জড়িত স্বরে বলিতেছিলেন—

"কলিকালে কি হ'লো বাবা, মেয়েমানুষেরও দাঁড়ি গজায়।"

দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখিলাম, মনে হইল, বুদ্ধদেব এই প্রকার দৃশ্য দেখিয়াই বোধ হয় গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন।

এই বাগানবাড়ির ব্যাপারটা যে আমি বিশদভাবে বর্ণনা করিলাম, তাহার কারণ এই যে এসব স্থানে যে সকল বীভৎস অভিনয় হয় তাহার প্রকৃত চিত্র সমাজের মঙ্গলের জন্য

প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। মানুষের মধ্যে সুপ্ত পশুত্ব এই সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই নগ্ন চিত্র আমার পাঠকগণকে যদি সজাগ করিয়া তুলিতে পারে তাহা হইলেই আমার লেখা সার্থক হইবে।

আমার কলেজ জীবনের মোটামুটি পরিচয় পাঠকগণকে উপহার দিলাম। এইভাবে জীবনযাপন করিয়াও আমি এম. এ. পাশ করিলাম। আমার M.A. উপাধি দুইপ্রকারেই সার্থক (Significant) হইয়াছিল। আমি কেবলমাত্র Master of Arts হইয়াছিলাম না, Master of Adultry অর্থাৎ ব্যভিচারেরও মাস্টার হইয়া কলেজ হইতে বাহির হইলাম।

পারিবারিক জীবন

আমার কলেজ জীবনের কথাই এ পর্যন্ত বলিয়াছি। এই সময়ের মধ্যে আমার পারিবারিক জীবনের কথা কিছুই বলি নাই। সেই সম্বন্ধেও কতকগুলি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

পূর্বেই বলিয়াছি পিতাঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে নানা ছুতায় অর্থ আনিতেছিলাম। পিতাঠাকুর মহাশয়ও বিনা আপত্তিতে সরল বিশ্বাসে সেই অর্থ জোগইতেন। কিন্তু পর পর দুই তিন বৎসর আমাদের দেশে অজন্মা হওয়ায় আমাদের অবস্থা খুব শোচনীয় হইয়া পড়িল। পিতাঠাকুর মহাশয় সাংসারিক ব্যাপারে অনেকগুলি বিষয়ে ব্যয় সংক্ষেপ করিলেন, কিন্তু পারিলেন না কৃপণতা করিতে আমার খরচ সম্বন্ধে এবং বাড়িতে বার মাসে যে তের পার্বণ হইত সেই সম্বন্ধে। তাঁহার নিষ্ঠাবান আস্তিক হৃদয় দেবপূজা সম্বন্ধে কোন প্রকার ব্যয় সংক্ষেপে সায় দিল না, ইহার ফলে তাঁহার কিছু টাকা ঋণ হইল। দুইটি অবিবাহিতা ভগ্নীর বিবাহ দিতে এবং আমার খুড়তুতো ভ্রাতার বিবাহ উৎসবেও কতকগুলি টাকা তিনি ঋণ করিতে বাধ্য হন। দুর্ভাগ্যক্রমে ভগ্নী দু'টির একটি বিবাহের ছয় মাস পরে এবং একটি বিবাহের একবৎসর পরেই বিধবা হয়। চরিত্রবান এবং আচারনিষ্ঠ দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে কেবলমাত্র সৎপাত্র দেখিয়া কন্যা দু'টির বিবাহ তিনি দিয়াছিলেন। সুতরাং বিধবা হওয়ার পর ভগ্নী দু'টির ভার আমাদেরই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই সকল কারণে যে দেনা হইয়াছিল তাহার সুদ চালাইতে বাবা অক্ষম হওয়ায়, সুদে আসলে দেনা ভীষণ আকার ধারণ করিতেছিল।

আমি ছুটিতে যখন বাড়িতে যাইতাম বাবা তখন এই সকল অবস্থা আমাকে বলিতেন। তাঁহার আশা ছিল আমি উপযুক্ত হইয়া বড় একটা চাকুরি লইলে এই সকল দেনা তিনি শোধ করিতে পরিবেন। আমাকেও যথাসম্ভব ব্যয় সংকোচ করিতে উপদেশ দিতেন। কিন্তু "চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি।" আমার বিলাসিতা সমান ভাবেই চালাইয়াছিলাম।

এম-এ পাশ করিবার অব্যবহিত পরেই বাবা আমার বিবাহ দিলেন নয় কি দশ বৎসরের একটি বালিকার সঙ্গে। বাবা পণ-প্রথার বিরোধী ছিলেন ; নিজের কন্যার বিবাহে বাধ্য হইয়া পণ দিতে হইলেও দাদার (খুড়তুতো ভ্রাতার) অথবা আমার বিবাহে তিনি পণ নেন নাই। আমার বিবাহ উৎসবে আরও কিছু দেনা হইল।

আমার (খুড়তুতো) দাদার ইতিমধ্যে দুইটি ছেলে হইয়াছিল। তিনি বাড়িতেই থাকিতেন এবং টোল করিয়া বিদ্যাদান করিতেন। ৬/৭টি ছেলে বাড়িতে রাখিয়া খাইতে দিয়া তিনি অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাবার ইহাতে সম্মতি এবং খুব উৎসাহ ছিল। তিনি বলিতেন—"যোগেশ আমার বংশের নাম উজ্জ্বল করেছে। ব্রাহ্মণের প্রকৃত কাজ

কচ্ছে। আমার সব খরচ যদি চলে এই পাঁচটা সাতটা ছেলেকেও আমি খেতে দিতে পারব।" দাদা যখন যাহা পাইতেন বাবাকে আনিয়া দিতেন এবং দু'টি পয়সার প্রয়োজন হইলেও বাবার নিকট চাহিয়া লইতেন।

পূর্বেই বলিয়াছি দাদাকে আমি মানুষ বলিয়া গ্রাহ্য করিতাম না। তাঁহার সাদাসিদা চাল চলন দেখিয়া তাঁহাকে একটা আহাম্মক বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁহাকে কোন দিন অসম্মান করিতে সাহসী হইতাম না। কারণ, তাহা হইলে আমি জানিতাম যে পিতা কখনো আমাকে ক্ষমা করিবেন না।

এই প্রকার অবস্থায় আমার বিবাহের দুই তিন মাস পরে হঠাৎ আমার পিতার মৃত্যু হইল। আমরা চতুর্দিক অন্ধকার দেখিলাম। পিতার শ্রাদ্ধ যথাযোগ্যভাবে সম্পাদন করিতে আরও কিছু দেনা হইল। পিতার মৃত্যুর পর দাদার সহিত সাংসারিক বিষয় লইয়া অনেক আলোচনা হইল। আমি দাদাকে টোল উঠাইয়া দিয়া কতকগুলি অযথা খরচ বন্ধ করিতে বলিলাম। তিনি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। উভয় ভ্রাতাতে এই লইয়া যথেষ্ট মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল। তখন বাবা ছিলেন না। সুতরাং আমার প্রত্যেক কথায়, তাহার প্রতি আমার এত দিনের সঞ্চিত ঘৃণা এবং অশ্রদ্ধা প্রকাশিত হইতে লাগিল। আমি তাহাকে এমন সব অসম্মানসূচক কথা বলিলাম—যাহা স্মরণ করিতেও এখন আমার লজ্জা বোধ হইতেছে। আমি এত সব অন্যায় কথা বলিবার পরও দাদা আমাকে শান্তভাবে কেবলমাত্র ইহাই বলিলেন—"আমি বুঝতে পাচ্ছি রমেশ, তুমি খুব উত্তেজিত হয়েছ। যে সব কথা তুমি আমাকে আজ বল্লে এর জন্য তুমি একদিন অনুতপ্ত হ'বে এ কথা আমি জানি।"

আমার ক্রোধ বাড়িয়া গেল। আমি প্রস্তাব করিলাম যে তাহার সহিত আমি একত্র থাকিতে ইচ্ছুক নই। টোল চালাইতে হয় তিনি নিজে চালাইতে পারেন। দাদা উত্তর করিলেন—"একথা তুমি অবশ্য বলিতে পার। আমি জীবনের ব্রত হিসাবে ইহা বেছে নিয়েছি, এই চতুষ্পাঠী করেই আমাকে এর ব্যয় চালাতে হবে। তোমার পক্ষে এর ব্যয় বহন করিবার কোন সংগত কারণ নেই, কারণ আমি যে চোখে এই জিনিসটাকে দেখছি তোমার সেই চোখে জিনিসটাকে দেখা সম্ভব নয়। কাজেই তুমি যদি পৃথক হতে চাও স্বচ্ছন্দে হতে পার।"

তাহার পরদিন গ্রামের দশজনকে ডাকিয়া আমাদের হাঁড়ি পৃথক করা হইল। চাষের যে জমি ছিল তাহাও গ্রামের দশজন মিলিয়া উভয়ের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন।

আমাদের পৃথক হওয়ার কয়েকদিন পর, বাবার উত্তমর্ণ আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং টাকা পরিশোধ করিতে বলিলেন। হিসাব করিয়া দেখা গেল সুদে আসলে প্রায় বার হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। আর একটি বিষয় দেখিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, বাবা তাঁহার নিজের অংশের সম্পত্তি রেহানাবদ্ধ রাখিয়া এই দেনা করিয়াছেন। দাদার অংশ আবদ্ধ নাই। আমি মনে মনে বাবার নির্বুদ্ধিতার জন্য তাঁহাকে অনেক দোষারোপ করিলাম। আমার তখন মনে হইল—আমার পৃথক হওয়ার প্রস্তাবে দাদা এত সহজে যে সম্মতি দিয়াছিলেন

তাহার কারণ আর কিছুই নহে, দাদা একথা জানিতেন। শ্রীরামপুর আসিয়া দুই চারজন উকিলের পরামর্শ লইলাম। তাঁহারা বলিলেন, আমি নিজের পায়ে কুঠার আঘাত করিয়াছি। একান্নবর্তী পরিবারের খরচ নির্বাহের জন্য দেনা হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করিতে পারিলে একজনের কৃত দেনার জন্য অপর শরিকও দায়ী হইয়া থাকেন। উত্তমর্ণ মহাশয়ের নিকট আবার গেলাম এবং উকিল বাবুর পরামর্শ অনুসারে উভয় ভ্রাতার নামে তাঁহাকে নালিশ করিতে বলিলাম। তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন।

আমার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে ন্যায়ত ধর্মত যাহাই হউক, যদি আইনে ফাঁক থাকে তাহা হইলে দাদা সেই সুযোগ লইয়া এই দেনার দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না। পৃথক হওয়ার পর হইতেই দাদার সহিত আমার কথাবার্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আদলতে নালিশ হইতে না দিয়া আপশে যাহাতে অনুগ্রহ পাইতে পারি তাহারই চেষ্টা করা উচিত মনে করিয়া উত্তমর্ণ মহাশয়ের বাড়িতে দু'চার জন লোক লইয়া অনেকবার যাতায়াতের পর স্থিব হইল যে, আমার অংশের সম্পত্তি কেবলমাত্র বাড়ির সংলগ্ন পাঁচ বিঘা ব্যতীত তাঁহাকে কবালা করিয়া দিতে হইবে। বাড়িখানা এবং পাঁচবিঘা জমি মাত্র রক্ষা পাইবে। আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম। স্ট্যাম্প খরিদ করিয়া লেখাপড়ার দিন স্থির হইল ; নির্দিষ্ট দিনে আমি যথাসর্বস্ব লিখিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়া উত্তমর্ণ মহাশয়ের বাড়িতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। লেখাপড়া আরম্ভ হইবে এমন সময় দাদা সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার আপাদমস্তক রাগে জ্বলিয়া উঠিল। বুঝিলাম আমি যে পথের ভিখারি হইতেছি তাহা দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে দাদা সেখানে গিয়াছেন। উপস্থিত দুই চারিজন এবং আমার মহাজন দাদাকে আসিতে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইয়াছিলেন। দাদা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া ফরাসের এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া আমার মহাজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গাঙ্গুলি ম'শায়! জ্যেঠা মহাশয়ের মোট দেনা কত দাঁড়িয়েছে? গাঙ্গুলি মহাশয় কাগজপত্র নাড়া চাড়া করিয়া বলিলেন—সুদে আসলে এগার হাজার পাঁচশ কুড়ি টাকা।" দাদা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—"রমেশের সঙ্গে কি রকম বন্দোবস্ত হলো।"

বন্দোবস্ত যাহা হইয়াছিল গাঙ্গুলি মহাশয় তাহা বুঝাইয়া বলিলেন—আমার অংশের সম্পত্তির আয় ৬০০ শত টাকা, ইহার মূল্য নয় হাজার পাঁচশত সত্তর টাকা সাব্যস্ত হইয়াছে। আমার অংশের পঁচিশ বিঘা জমির মধ্যে বাড়ির সংলগ্ন পাঁচ বিঘা বাদ রাখিয়া অবশিষ্ট বিশ বিঘার মূল্য চৌদ্দশত টাকা স্থির হইয়াছে। মোট দশ হাজার নয় শত সত্তর টাকা মূল্যের সম্পত্তি লইয়া তিনি আমাকে অব্যাহতি দিতেছেন। তাঁহার সুদে আসলে প্রাপ্য মোট টাকা হইতে এই টাকা গেলে পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা তথাপি তাঁহার প্রাপ্য থাকে, তা' আর কি করিবেন। বাধ্য হইয়াই টাকাটা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইতেছে—দাদার (আমার পিতা) পুত্রকে তো আর তিনি ভিটে ছাড়া করিয়া পথে বসাইতে পারেন না ; ইত্যাদি ইত্যাদি।

গাঙ্গুলি মহাশয়ের এই মহানুভবতায় আমার মনের যে ভাব হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করা সম্ভব নহে। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে, আসল চারি হাজার টাকায় বার হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। সেই অবস্থায় পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা ছাড়িয়া দিয়া মহানুভবতা প্রকাশ করিতে দেখিয়া আমার নরমেধ যজ্ঞ নাটকের রত্নাকরের কথা স্মরণ হইল। কিন্তু কি করিব, চুপ করিয়া এই সব কথা শোনা ভিন্ন আমার গত্যন্তর ছিলনা।

দাদা একটা কাগজে কয়েকটা হিসাব করিলেন, তারপর যে কথা বলিলেন তাহা শুনিয়া শুধু আমি কেন সেখানে যাঁহারা ছিলেন সকলেই অবাক হইয়া গেলেন। দাদা বলিলেন—"গাঙ্গুলি মহাশয়! জ্যেঠা মহাশয় এ দেনা করিয়াছিলেন আমরা যখন একান্নবর্তী ছিলাম সেই সময় ; রমেশের সঙ্গে যদিও পৃথক হয়েছি তথাপি আইনত হোক না হোক ন্যায়ত ধর্মত এই দেনার অর্ধাংশের জন্য আমি দায়ী। আমাদের দুই ভাই-এর সম্পত্তির আয় দুই শত ত্রিশ টাকা বাদে অবশিষ্ট সম্পত্তি আপনি কিনে নিন। তার দাম দাঁড়াবে পনের হাজার ছয়শ' নব্বুই টাকা। আপনাকে সুদ মাফ দিয়ে অনুগ্রহ কত্তে হবে না। আপনার এগার হাজার পাঁচশত কুড়ি টাকা সম্পূর্ণ ওই দাম থেকে কেটে নিয়ে অবশিষ্ট টাকা আমাদের দুই ভাইকে দিন।"

গাঙ্গুলি মহাশয় বোধ হয় প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করিতেই পারিলেন না। যেখানে আইনে ধরিতে পারে না সেখানে স্বেচ্ছায় এতবড় স্বার্থত্যাগ ন্যায় ও ধর্ম—গাঙ্গুলির অভিধানে যাহার কোন অর্থই নাই—শুধু তাহারই জন্য, ইহা বুঝিবার উপযুক্ত মনোবৃত্তি গাঙ্গুলি মহাশয়ের মোটেই ছিল না। শুধু গাঙ্গুলি মহাশয় কেন অনেকেরই ছিল না। দাদার এই স্বার্থত্যাগ বেকুবিরই নামান্তর বলিয়া অনেককে বলিতে শুনিয়াছি। আমি লম্পট বেশ্যাসক্ত যাহাই হই, আমি সেই দিন বুঝিতে পারিলাম যে, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার তুলনায় দাদার শিক্ষা দাদাকে গড়িয়াছে শিব, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাকে গড়িয়াছে বানর।

আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। কোন কথাও বলিতে পারিলাম না, যেখানে বসিয়াছিলাম সেখান হইতে ছুটিয়া যাইয়া দাদার পা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম ; এই দেবতুল্য দাদাকে কি না আমি বলিয়াছি! দাদা আমার দুটি হাত ধরিয়া তুলিয়া আমাকে পাশে বসাইলেন এবং এক হাতে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া, অন্য হাতে তাঁহার চাদর দিয়া আমার চোখ মুছাইয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ তর্কবিতর্কের পর গাঙ্গুলি মহাশয় দাদার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন ; সম্পত্তিটি সম্পূর্ণ লাভ করিবার জন্য তাঁহারও আগ্রহ ছিল। দলিল লেখাপড়া হইল। কেবলমাত্র বাড়ি ও পাঁচ বিঘা জমির পরিবর্তে, আমার বাড়ি, পঁচিশ বিঘা জমি এবং গ্রামের মধ্যে একশত পনের টাকা বাৎসরিক আয়ের সম্পত্তি আমার রহিল। তাহার উপর নগদ প্রায় দুই হাজার টাকা আমি পাইলাম। দাদারও ঠিক ওই পরিমাণ সম্পত্তি এবং টাকা থাকিল। পৈত্রিক সম্পত্তি অবশিষ্ট বিসর্জন দিয়া দুই ভাই বাড়ি ফিরিলাম।

বাড়িতে বসিয়া থাকিবার অবস্থা আমার ছিল না। সুতরাং আমি চাকরির চেষ্টায় কলিকাতা আসিলাম। বাড়িতে মা'র নিকট খরচ পত্রের জন্য পাঁচশত টাকা রাখিয়া নগদ দেড় হাজার টাকা লইয়া আমি কলিকাতা ফিরিলাম। পিসিমার প্রদত্ত তিন হাজার টাকার মধ্যে আমার প্রায় দেড় হাজার টাকা এতদিনের বিলাসিতায় খরচ হইয়া গিয়াছিল ; সেই দেড় হাজার টাকা পুনরায় ব্যাঙ্কে রাখিলাম। এই সময় আমি মানদার পিতার বাড়িতেই প্রথম উঠিলাম এবং তঁহাকেই আমার জন্য চাকুরি করিয়া দিতে বিশেষ ভাবে ধরিলাম। তাঁহার চেষ্টায় লালবাজারের গ্রেস্ ব্রাদার্সের অফিসে মাসিক দুইশত টাকা বেতনে আমার চাকুরি হইল। মানদা তাহার আত্মচরিতে লিখিয়াছে যে আমি কোন অফিসের বড়বাবু হইয়াছিলাম, এ কথা সে ভুল লিখিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে উচ্চপদস্থ একজন কেরানির কার্যে আমি নিযুক্ত হইয়াছিলাম।

মানদা ও আমি

মানদার সহিত অবৈধ সংসর্গের কথা মানদা তাহার "শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত" নামক পুস্তকে ঢাক ঢোল বাজাইয়া প্রচার করিয়াছে। বাংলার অনেক পাঠকই তাহা অবগত আছেন। সে সম্বন্ধে আমি বেশি কোন কথা বলিব না। কয়েকটি কথা কেবল বলা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। মানদা আমার সম্বন্ধে কতকগুলি মিথ্যা কথা বলিয়াছে এবং নিজের কতকগুলি কথা গোপন করিয়াছে। ইহার কারণও যে আমি না বুঝিতে পারিতেছি তাহা নহে। তাহার পুস্তকের প্রথম সংস্করণের "আমার কৈফিয়ৎ" শীর্ষক বিজ্ঞাপনের শেষ ভাগে সে লিখিয়াছে—

'এই জীবনীতে আমার ফটোচিত্র দিতে ইচ্ছা করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু আমায় ভূতপূর্ব শিক্ষক মুকুলচন্দ্র বানার্জি উকীল মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে তাহা দেওয়া হইল না।'

ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে শ্রীমান্ মুকুলচন্দ্রই তাহাকে এই জীবনচরিত প্রকাশ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এই জীবনচরিতের খুবই কাটতি হইয়াছে, পর পর চার পাঁচটি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থখানি হিন্দিতে এবং ইংরাজিতেও অনুবাদিত হইয়াছে শুনিয়াছি। মুকলচন্দ্রের ন্যায় মক্কেলহীন উকিল এই সুযোগে বেশ একটি দাও মারিয়াছেন, তাহাও আমি বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু এই মুকুলচন্দ্র আমাকে মানদার সর্বনাশের কারণ স্বরূপ লোকসমাজে প্রচার করিয়া এক ঢিলে দুই পাখি মারিয়াছেন। নিজেকে সাধু বলিয়া বাজারে জাহির করিয়াছেন এবং আমার দুর্নীতি প্রকাশ করিয়া আমার সহিত তাঁহার পুরাতন শত্রুতার প্রতিশোধ লইয়াছেন।

মুকুলের সহিত আমার শত্রুতার কারণ আমি সংক্ষেপেই বলিব। ব্যারিস্টার কন্যা ঊষার কথা আমি পূর্বে বলিয়াছি। মুকুলচন্দ্র ঊষার প্রণয়-প্রার্থী ছিল। সেই সমাজে অনেক সান্ধ্য সম্মিলনে মুকুলের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। কিন্তু ঊষা তাহাকে মোটেই দেখিতে পারিত না। তাহার যে পোশাক ও হাবভাবের চিত্র মানদা তাহার পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দিয়াছে তাহার একবর্ণও অতিরঞ্জিত নহে। ঊষা মুকুলের ওই প্রকার সাজগোজটাই সকলের চেয়ে বেশি অপছন্দ করিত। মুকুলের অসাক্ষাতে অনেক দিন আমাকে বলিয়াছে—"ওটা একটা সং"। কবিতা লেখার বাই মুকুলের খুবই ছিল, আমরা জানিতাম তাহার অধিকাংশেরই ভাব এবং অনেক স্থলে ভাষা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণের কবিতা হইতে চুরি করা। ঊষার উদ্দেশে লিখিত অনেক কবিতা ঊষা আমাকে পরে দেখাইয়াছিল। মলয় বাতাস, চাঁদনী রাত, কুঞ্জবন আর বাঁশির গানে সেই সব কবিতা পরিপূর্ণ ছিল। আমরা ইহা লইয়া অনেক হাসাহাসি করিয়াছি। মুকুল টের

পাইয়াছিল যে উষা আমার প্রতি অনুরাগিনী এবং সে সন্দেহ করিয়াছিল উষার সহিত আমার গুপ্ত প্রণয়ের কথা ; সেই জন্যই সে আমার প্রতি তখন মর্মান্তিক চটিয়াছিল।

তৎপর আরও কতকগুলি স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারে তাহার সহিত গুণেন্দ্রের বিশেষ মতান্তর ঘটে। মুকুলও আমাদের মত চরিত্রহীন ছিল। এই সকল স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারে আমি গুণেন্দ্রের সাহায্য করিয়াছিলাম এবং আমার সাহায্যে গুণেন্দ্র তাহার দুই একটি মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছিল। সেজন্যও আমার এবং গুণেন্দ্রের উপর তাহার বিশেষ ঈর্ষার কারণ ঘটিয়াছিল।

আমি প্রথম যেদিন মানদাদের বাড়িতে মুকুলকে দেখিলাম, সেইদিন অবশ্য তাহার সহিত খুব ভদ্রভাবেই আলাপ করিয়াছিলাম। সেইদিনই আমার মনে গুরুতর সন্দেহ হইল। মানদার ন্যায় প্রাপ্ত যৌবনা সুন্দরীর প্রাইভেট মাস্টার আমাদের মুকুলচন্দ্র! আমি খুব সতর্ক ও গোপনে তাহাদের আচার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ রাখিতে লাগিলাম। প্রায় মাসাধিক কাল তাহাদের বাড়িতে থাকিয়া পরে বোর্ডিং-এ গিয়াছিলাম। এই সময়ের মধ্যেই জানিতে পারিলাম যে মানদার কুমারীধর্ম অক্ষত নাই। মুকুলই তাহার গুপ্ত প্রণয়ী। দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী পত্নীর প্রেমে মত্ত মানদার পিতার অন্য কোন দিকে লক্ষ করিবার অবকাশ নাই। যদি না জানিতাম যে মানদা পতিতা হইয়াছে, তাহা হইলে হয়ত মানদার সর্বনাশ করিবার প্রবৃত্তিই আমার প্রাণে জাগিত না। মানদার অসামান্য সৌন্দর্য এবং যৌবনের প্রথম উন্মেষে তাহার পরিপূর্ণতা আমাকে আকর্ষণ করিলেও সে নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত বলিয়া আমি খুব সম্ভব আপনাকে সম্বরণ করিয়াই চলিতাম, যদি না জানিতাম যে সেই সৌন্দর্য মুকুল উপভোগ করিতেছে। একজনের নিকট যে আত্মদান করিয়াছে আমার নিকটও সে সহজ লভ্য, এই জ্ঞানই আমাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। মানদা কিন্তু মুকুলের সঙ্গে তাহার সম্পর্কের কথা একেবারেই চাপিয়া গিয়াছে।

"মানদা বলিয়াছেন, আমার সঙ্গে রমেশদার প্রণয়ের কথা মুকুলদার নিকট গোপন ছিল না—এই উপলক্ষে তাঁর নূতন কবিতার বই রচিত হইয়া গেল।" গোপন ছিল না একথা সত্য, কিন্তু কবিতা রচনার কথা আমি ঠিক বলিতে পারি না। গোপন ছিল না, তাহার কারণ এই যে মুকুলের প্রেমে তখন ভাটা ধরিয়া আসিয়াছিল। মানদার বন্ধু কমলার প্রতি তাহার আকর্ষণ বাড়িয়া উঠিয়াছিল এবং কি করিয়া সে মানদার কবল হইতে অব্যাহতি পাইয়া, কমলা লাভের জন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টিত হইতে পারে তাহারই সুযোগ খুঁজিতেছিল। সুতরাং আমি যখন আসরে নামিলাম, তখন সে দুঃখিত না হইয়া স্বস্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল এবং পূর্ব শত্রুতা তৎকালের জন্য বিস্মৃত হইয়া মানদাকে লইয়া আমার পলায়নের সাহায্য করিয়াছিল।

মানদা আমার নামে চোর অপবাদ দিয়াছে ইহাও আর একটি মিথ্যা কথা। আমি অফিসের ক্যাস ভাঙিয়া টাকা লইয়া যাই নাই। পিসিমার প্রদত্ত ও সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া

যে তিন হাজার টাকা ব্যাঙ্কে রাখিয়াছিলাম তন্মধ্যে হাজার টাকা উঠাইয়া সেই টাকা খরচ করিয়া আমি মানদাকে লইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছিলাম। কমলা যে পত্র মানদাকে লিখিয়াছিল, তাহা পরে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে উহা মুকুলেরই কারসাজি। মুকুল ওই প্রকার মিথ্যা কথা কমলার নিকট বলায়, তাহা বিশ্বাস করিয়া ওই পত্র লিখিয়াছিল।

মানদাকে ছাড়িয়া আসিলাম কেন, সে সম্বন্ধেও মানদা মিথ্যা লিখিয়াছে। আমি যে চিঠি লিখিয়া মথুরায় তাহাকে ফেলিয়া পলায়ন করি বলিয়া সে প্রকাশ করিয়াছে তাহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। ওই চিঠিখানা আমাকে লোকচক্ষে হীন করিবার জন্য শ্রীমান মুকুলচন্দ্রের ওকালতি সেরেস্তা হইতে রচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। [দ্র. পৃ-৪৬] আমি লম্পট হইলেও এমন পাষণ্ড ছিলাম না যে একটি রমণীকে বিপদে ফেলিয়া চলিয়া আসিব।

প্রকৃত পক্ষে মথুরায় যেদিন মানদা কমলার পত্র পাইয়া আমাকে চোর জোচ্চোব ইত্যাদি বলিয়াছিল, তার পরদিন হইতেই তাহার সহিত আমার ছাড়াছাড়ি হয়। নেশার মুখে মানদার ওই প্রকার মিথ্যা গালাগালিতে আমি উত্তেজিত হইয়া মানদাকে দু'এক ঘা বসাইয়া দিয়াছিলাম একথা সত্য, কিন্তু আমি লাথি মারি নাই। পরদিন অনুতপ্ত হইয়া আমি তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনাও করিয়াছিলাম কিন্তু সে আমাকে বলিয়াছিল—"আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না। আমি নিজের পথ নিজেই বেছে নেবো—"

আমি তাহাকে অনেক বুঝাইলাম কিন্তু সে কিছুতেই আমার সঙ্গে থাকিতে চাহিল না, বাধ্য হইয়া আমি তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া আসিলাম।

আমি কলিকাতাতেই ফিরিয়া আসিলাম। একটা মেসে থাকিয়া চাকুরির চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু ভাগ্যে চাকুরি মিলিল না। ব্যাঙ্কে যে পাঁচশত টাকা ছিল তাহার অধিকাংশ এই চাকুরির চেষ্টায় খরচ হইয়া গেল। শুধু চাকুরির চেষ্টায় বলিলে অন্যায় বলা হইবে—আমি তখন রীতিমত মাতাল ছিলাম। দৈনিক মদ ছাড়া চলিত না। পূর্ব-পরিচিত দু'চারটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়াতে তাহাদিগকে লইয়া মাঝে মাঝে মজলিস, বেশ্যালয়ে গমন প্রভৃতিও চলিতে লাগিল।

এই সময় আমাদের গ্রামে ভীষণ কলেরার প্রাদুর্ভাব হইল। আমাদের গ্রামের বহুলোক এই ভীষণ ব্যাধির আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমার বাড়িতে প্রথম আমার মাতাঠাকুরাণী, তারপর আমার স্ত্রী, একটি বোন এবং ছোট ভাইটি মৃত্যুমুখে পতিত হইল। দশ দিনের মধ্যে আমার গৃহ শ্মশানে পরিণত হইয়া গেল। সংসার বন্ধন বলিতে আমার কিছু রহিল না। একটি মাত্র বিধবা ভগ্নীকে দাদার বাড়িতে রাখিয়া আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

দশদিনের ভিতর এই প্রকার ভীষণ আঘাত পাইয়া আমি কেমন যেন হইয়া গেলাম। মানসিক অশান্তি ভুলিবার জন্য কেবলই বেশ্যালয়ে পড়িয়া মদ খাইতে লাগিলাম। জমি

বাড়ি আবার গাঙ্গুলি মহাশয়ের নিকট রেহানে আবদ্ধ রাখিয়া টাকা আনিলাম। এই সময় আমি একপ্রকার পাগল হইয়াছিলাম, চৈতন্য হারাইয়াছিলাম। বোধ হয় দুই তিন বৎসর এইভাবে চলিবার পর যখন আমার চৈতন্য হইল, দেখিলাম আমি পথের ভিখারি হইয়াছি।

ভিখারি হইলাম কিন্তু মদ ছাড়িতে পারিলাম না। নানা স্থানে কাজকর্মের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ঠিকা কেরানিগিরি মাঝে মাঝে জুটিত, আবার কিছুদিন জুটিত না। বন্ধুবান্ধবগণের কাহারও কাহারও নিকট হাওলাত চাহিয়া কিছুদিন চলিল, তারপর হাওলাতও মিলিত না। বিলাতি মদের পরিবর্তে স্বদেশি 'ধান্যেশ্বরীর' আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। অবশেষে এমন হইল তাহাও জুটিত না, তখন সস্তার এক পয়সার নেশা গঞ্জিকাই সম্বল হইয়া দাঁড়াইল।

বড় ঘরের কথা

দুরবস্থার চরম অবস্থায় পড়িয়াছিলাম, এমন সময় হঠাৎ আমার ভাগ্যাকাশ সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। একদিন কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দেখিলাম—

"Wanted a smart man for confidential works, should be intelligent, up to date and obedient. Pay Rs. fifty Per month, besides free board and lodging. Apply to Box No. 2930 Statesman.

একখানা দরখাস্ত করিলাম। অবশ্য এমন দরখাস্ত অনেকই করিয়াছি। কিন্তু কোনটারই উত্তর পাই নাই। হঠাৎ ইহার একটা উত্তর পাইলাম। দর্জিপাড়া অঞ্চলের এক এটর্নির (তাঁহার নাম আমরা যক্ষ বাবু বলিব) নাম স্বাক্ষরিত একখানা পত্র পাইলাম, তাহাতে তিনি আমাকে তার পর দিন রাত্রি নয়টার সময় দেখা করিতে লিখিয়াছেন। যথা সময়ে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সুসজ্জিত কক্ষে বাবু একাকী বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে বাবু নেশা করিয়াছেন। কণ্ঠস্বর ঈষৎ জড়িত, চক্ষু দুটি প্রকাণ্ড দেখিয়া বুঝিলাম কেবলমাত্র আমোদ আরম্ভ হইয়াছে। বাবুর সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে অমি লুকাইয়া সতৃষ্ণ নয়নে ডিকেণ্টারের দিকে তাকাইতে ছিলাম। কারণ অর্থের অভাব হওয়ার সঙ্গে "ধান্যেশ্বরীই" [আগের পৃষ্ঠায় 'গঞ্জিকাই সম্বল হইয়া দাঁড়াইল। আবার এখন ধান্যেশ্বরী' সংকলক] আমার সম্বল হইয়াছিল, ওই প্রকার মদের সঙ্গে অনেক দিন পরিচয় ছিল না।

বাবুর সঙ্গে আমার যে সকল কথা হইল তাহার বিস্তারিত বিবরণ দিবার আবশ্যকতা নাই। এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বাবু আমাকে জানাইয়া দিলেন যে তাঁহার একটি রক্ষিতা আছে তাহাকে তিনি স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়াছেন, আমাকে তথায় থাকিতে হইবে। সেখানে পাচক ব্রাহ্মণ ও চাকর আছে, সেইখানেই আমার খাওয়া চলিবে। বাজার করা, রক্ষিতাটির আদেশ অনুসারে জিনিসপত্র ক্রয় করিয়া দেওয়া, এক কথায় বাজার সরকারের কার্য আমাকে করিত হইবে। সর্বোপরি গো পনে গোপনে লক্ষ রাখিতে হইবে যে অন্য কেহ তাহার মাথায় হাত বুলাইতে চেষ্টা করে কি না। আমার তখন এমন অবস্থা যে আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে এই ঘৃণিত কার্য করিতেই প্রস্তুত হইলাম।

বলা বাহুল্য, বাবু একেবারে সোজাসুজি ভাবে এই প্রস্তাব আমার নিকট উপস্থিত করেন নাই ; আমাকে অনেক জেরা করিয়া আমার পূর্ববর্তী জীবনের অনেক সংবাদ বাহির করিয়া লইয়া, তাহার পর ঘুরাইয়া কথাটি উপস্থিত করিয়াছিলেন। যখন কথাবার্তা স্থির হইল তখন বাবুর নেশা বেশ জমিয়াছে। কারণ কথাবার্তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মদও চালাইতে ছিলেন। কথাবার্তা শেষ হইলে তিনি একটি গ্লাসে মদ ঢালিয়া তাহাতে সোডা মিশাইয়া আমার দিকে সরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন—"Let us dirnk for our future good understanding"—অর্থাৎ "আমরা ভবিষ্যতে পরস্পরের সহিত প্রীতি রক্ষা করিতে পারিব, তাহার সূচনা স্বরূপ এসো একত্র পান করা যাক।" আমি একটু ইতস্তত করিতেছি দেখিয়া হাসিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"আর ন্যাকাম কচ্ছ কেন বাবা? লুকিয়ে যে ভাবে বোতলটার দিকে তাকাচ্ছিলে, মনে করেছ আমার চোখে তা পড়েনি—কুচ পরোয়া নেই—খেয়ে ফেল। আমার কাছে যদ্দিন থাকবে অন্নবস্ত্রের অভাব হতে পারে—কিন্তু এ জিনিসটার অভাব হবে না"—বলিয়া নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গ্লাসটি হাতে করিয়া একটু আড়ালে যাইয়া এক নিশ্বাসে সাবাড় করিয়া আসিলাম। বাবু আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—"বাঃ বাঃ, এটিকেট দুরস্ত আছে ত!"

তাহার পরিদন হইতেই আমি আমার নূতন কার্যে ব্রতী হইয়া আমার কর্ত্রী ঠাকুরানির সন্দর্শন লাভ করিলাম। জানিতে পারিলাম তাঁহার নাম "কমলা"। এইখানে কমলার একটু বর্ণনা করা প্রয়োজন। আমি যখন তাহাকে দেখিলাম, তখন তাহার যৌবন স্রোতে প্রায় ভাটা ধরিয়াছে, কিন্তু তাহার রূপে, তাহার চলাফেরায়, তাহার চটুল কটাক্ষে এমন একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল, যাহা অনেক পূর্ণ যুবতীর মধ্যেও নাই। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম, কমলা তখন তিনটি কন্যার জননী কিন্তু তাহার স্বাস্থ্য, দেহ-সৌন্দর্য, চমৎকার বেশভূষা এবং সজীবতা দেখিলে কেহই সে কথা অনুমান করিতে পারিত না। তাহার সৌন্দর্য ছিল সেই প্রকার, যে সৌন্দর্য শ্রদ্ধার উদ্দীপক নহে, কেবল মাত্র কামোদ্দীপক।

আমি কাজে ভর্তি হইলাম। কমলা মনিব আমি ভৃত্য, এই সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াই আমি কাজ করিতে লাগিলাম কিন্তু আমার মনের ভিতর কামনার অগ্নিতে ইন্ধন প্রদান করিতে লাগিল। সে মাঝে মাঝে এমন ভাবে আমার সহিত কথা বলিত, এমন ভাবে আমার দিকে তাকাইত, যাহাতে আমার মধ্যে একটা ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইত। আমার যেন মনে হইত, আমিও যেমন কমলাকে চাই, সেও তেমন বোধ হয় আমাকে চায়। কিন্তু আমি সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছিলাম না, কারণ যে চাকুরিটি অনশনে মৃত্যুর দরজা হইতে আমাকে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহা খুয়াইবার ইচ্ছা ছিলনা। যদি আমি অগ্রসর হই আর কমলা চটিয়া যক্ষ বাবুকে তাহা বলে, তাহা হইলে সেই দিনই আমার চাকুরিটার দফারফা হইবে এই জ্ঞান আমার ছিল।

যক্ষবাবু প্রায় প্রত্যহই আসিতেন, কোন দিন সম্পূর্ণ রাত্রি, কোনদিন নয়টা দশটায় ফিরিয়া যাইতেন। মাঝখানে একবার তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। প্রায় দশদিন আসিতে পারিলেন না। আমি দৈনিক তাঁহার বাড়ি যাইয়া সংবাদ লইয়া আসিতাম। এই সময়ে একদিন রাত্রি প্রায় দশটার সময় আমি আমার ঘরে বসিয়া আছি, আহারাদি শেষ হইয়াছে, এমন সময় কমলা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল। আমি কমলার ঘরে যাইয়া দেখিলাম সে বিছানায় শুইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া বলিল—"রমেশ বাবু! আমার মাথাটা বড় ধরেছে, স্থির থাকতে পাচ্ছিনে, কি করি বলুন তো?"

আমি বলিলাম—''ঘরে অডিকলোন আছে কি? মাথায় দিলে বেদনাটা কমে যাবে'খন।"

কমলা দেখাইয়া দিল, একটা ড্রেসিং টেবিলের উপর অডিকলোন ছিল, আমি জল মিশাইয়া তাহা কমলার মাথায় দিতে লাগিলাম এবং বিছানার একপার্শ্বে বসিয়া একখানা পাখা লইয়া আস্তে আস্তে বাতাস করিতে লাগিলাম। কমলা ছটফট করিতে করিতে এক একবার আমার কোলের উপর মাথা রাখিতে লাগিল। সেদিনও সন্ধ্যার সময় অন্যান্য দিনের মত মদ খাইয়াছিলাম। নেশাও বেশ জমিয়াছিল, হিতাহিত জ্ঞান খুব ছিল না, কমলার মাথা ও কপালে অডিকলোন দিতে দিতে আমি জল মুছাইবার ছলে তাহার গাল টিপিয়া দিলাম। কমলা অমনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে কমলা আমাকে যাহা বলিল, তাহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম যে আমার মতন সেও আমার প্রতি মনে মনে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিতেছিল। মাথার বেদনা তাহার একটা ভাণ মাত্র। আমাকে প্রলোভিত করিবার জন্যই তাহার মাথা বেদনার সৃষ্টি। আমিও অকপটে স্বীকার করিলাম যে কেবলমাত্র তাহার ভয়েই আমি অগ্রসর হইতে সাহসী হই নাই। নতুবা আমার আগ্রহও তাহার অপেক্ষা কম ছিল না। প্রকাশ্যে আমরা উভয়ই সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকিতাম।

ইহার কিছুদিন পর তাহার জীবনের কাহিনি আমাকে সম্পূর্ণ খুলিয়া বলিয়াছিল। তাহার ইতিহাস শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। কমলা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার জমিদার প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশে। তাহার বিবাহও হইয়াছিল ইটালীর [এন্টালী] কোন প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় বংশে ; তাঁহার স্বামীটি, এল. মুখার্জি বেশ সুন্দর ও সুপুরুষ ছিলেন। স্বামীর ঔরসে কমলার গর্ভে তিনটি কন্যা হয়। তাহাদের নাম যথাক্রমে সাবিত্রী, সুকৃতি ও সুপ্রভা। পিত্রালয়ে গেলে কমলা মাঝে মাঝে তাহার দাদা মহাশয় সম্পর্কিত জনৈক শিক্ষিত রাজপ্রদত্ত উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত জমিদারের বাড়িতে বেড়াইতে যাইত। জমিদার মহাশয় কমলাকে স্নেহ প্রদর্শন করিয়া নানাপ্রকার দ্রব্যাদি দিতেন। আত্মীয়ের দান বলিয়া কমলা তাহা লইতে কোন দ্বিধা বোধ করে নাই, তখন সে বুঝিতে পারে নাই যে এই দানের অন্তরালে কোন অসদভিপ্রায় লুক্কায়িত ছিল। কিন্তু একদিন সে তাহা জানিতে পারিল। দাদামহাশয় একদিন তাহার নিকট অসৎ প্রস্তাব করিলেন। কমলা ঘৃণা ভরে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু দাদামহাশয় বলপূর্বক তাহার সতীত্ব নষ্ট করিলেন। তাহার পর নানাপ্রকার প্রলোভনে এবং দাদামহাশয়ের নানাপ্রকার চেষ্টার ফলে সে নিয়মিতভাবে তাঁহার কামনা চরিতার্থ করিয়াছে। এমন কি তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বাগান বাড়িতেও গিয়াছে। কমলার স্বামী জাহাজে স্টোরকিপারের কার্য করিতেন। একযোগে চার পাঁচ মাস কাল অনুপস্থিত থাকিতেন। এই সমুদয় ব্যাপার সেই সময়ই সংঘটিত হইত।

এদিকে নানাপ্রকার কাণাঘুষার ফলে, তাহার স্বামীর মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। একবার বিলাত হইতে আগত জাহাজ হইতে নামিয়াই কমলার পিত্রালয়ে যাইয়া তিনি তাহার

অনুসন্ধান করেন। সেখানে তাহাকে না পাইয়া তিনি ঐ দাদামহাশয়ের নিকট যান। সেখানে যাইয়া তিনি সংবাদ পান যে দাদামহাশয় বাগানবাড়িতে গিয়াছেন এবং কমলাও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। তাঁহার সন্দেহ তখন দৃঢ়ীভূত হয়। তিনি সরাসরি সেই বাগান বাড়িতে যাইয়া বিনা সংবাদে ভিতরে প্রবেশ করেন এবং উভয়কে একত্র দেখিতে পান। কমলা তখন স্বামীর সহিত চলিয়া আসিতে বাধ্য হয় এবং স্বামীর নিকট হইতে যথেষ্ট তিরস্কার, অবশেষে বিষম প্রহার পর্যন্ত লাভ করে।

কথাটা তখন তাঁহাদের পারিবারিক গন্ডির ভিতরে প্রকাশিত হইয়া যায়। স্বামীর গৃহে কমলার আর স্থান হয় না। ভ্রাতার বাড়িতে বাস করিতে থাকে। তাহার ভ্রাতা যাহার নাম আমরা শ্যামানন্দ বলিব, তিনি ঘৃণায় এবং লজ্জায় পাথুরিয়াঘাটার বাস পরিত্যাগ করিয়া মাক্‌লয়েড স্ট্রীটে উঠিয়া আসেন। অপর ভ্রাতা (?) উৎফুল্ল পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতেই থাকেন। ভ্রাতার বাড়িতেও কমলার জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠে। সর্বদা তিরষ্কার গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। কমলা যখন দাদামহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বাগান বাড়িতে যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাঁহার দুটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে তিনি কমলার পরিচয় করাইয়া দেন। তাহার একজন আমার বর্তমান মনিব য়ক্ষবাবু, দ্বিতীয়টি কলিকাতার উত্তর অঞ্চলের কায়স্থবংশীয় এক রাজকুমার, তাঁহাকে আমরা কুমার অনঙ্গনাথ বলিয়া উল্লেখ করিব। ইহারা দুইজনই কমলার রূপে আসক্ত হইয়াছিলেন। কমলার ভ্রাতা ম্যাক্‌লয়েড স্ট্রীটে উঠিয়া যাওয়ার পর ইহারা দু'জনই চেষ্টা করিতে লাগিলেন—যাহাতে কমলাকে কুলের বাহির করিতে পারেন। ঝি চাকরানির হাত দিয়ে চিঠিপত্রাদি আদান প্রদান চলিতে লাগিল। কমলাও ভ্রাতার গৃহে একপ্রকার অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব হইতে যোগাযোগ করিয়া বাড়ির দারোয়ানকে সরাইয়া দিয়া য়ক্ষ বাবুর মোটরে একদিন সে গৃহ ত্যাগ করে, তদবধি সে য়ক্ষ বাবুর রক্ষিতা রূপে বাস করিতেছে।

কমলার জীবনের ইতিহাস শুনিয়া মনে অনেক কথাই উদয় হইয়াছিল। যে অপরাধে অপরাধী হইয়া আমি আত্মীয়স্বজনের নিকট ঘৃণিত তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়াও রাজা মহারাজা রাজকুমার এটর্নি উকিল দেশনেতা প্রভৃতি আজ সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া শত শত স্তাবক পরিবেষ্টিত হইয়া পূজা পাইতেছে। আমার নিজের অদৃষ্টকেই আমি ধিক্কার দিলাম, তখনও আমার লাম্পট্যের উপর কোন ঘৃণার ভাব আসে নাই ; বরং এই ইতিহাস শুনিয়া মনে মনে একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছিলাম এই ভাবিয়া যে—এই সকল বিখ্যাত লোকও যখন এই সব কার্যে ব্রতী তখন আমার আর অপরাধ কি? গল্পে শুনিয়াছিলাম কোন এক পণ্ডিত ধার্মিক গুরুদেব তাঁহার এক মদ্যপ বেশ্যাসক্ত এবং লম্পট শিষ্যকে তাহার এই সকল কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছিলেন এবং তাহা না করিলে পরলোকে তাহার অনন্ত নরকভোগ হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছিলেন। শিষ্য অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া গুরুর বক্তৃতা শুনিতেছিল, অবশেষে

জিজ্ঞাসা করিল—"প্রভু—আমাদের পাড়ার মেজবাবু তো খুব মদ খান, আমোদ করেন, তিনিও নরকে যাবেন?" প্রভু উত্তর করিলেন—হ্যাঁ নিশ্চয় যাবে।"

আবার প্রশ্ন হইল—"ও পাড়ার শ্যামা, কেবলা, ফট্‌কে মেধো এরাও তো মদ খায়—এরাও নরকে যাবে?" প্রভু কহিলেন "নিশ্চয়—কোন ভুল নেই।"

শিষ্য আবার জিজ্ঞাসা করিল—"পট্‌লী, খেঁদি, সুহাসিনী, বিমলী এরাও নরকে যাবে?"

প্রভু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"এরা বেশ্যা—এরা নরকে যাবে না তো যাবে কে?"—

শিষ্য তখন লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"তবেতো নরক গুলজার। স্বর্গে তাহলে কোন শালা যেতে চায়! আমিও নরকেই যাব।"

আমার মনের ভাবও গল্পোক্ত ওই শিষ্যের মতনই অনেকটা হইয়াছিল, একথা বলা যাইতে পারে।

যাহা হউক কমলার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এদিকে কমলার প্রতি য়ক্ষ বাবুব আকর্ষণ যেন কমিয়া আসিতে লাগিল। টাকা পয়সা দিতে তিনি কৃপণতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একই রমণীতে বহুদিন উপগত হওয়ার ফল, লম্পট-স্বভাব-সুলভ ভোগাবসন্নতা (Setiety) তাঁহার আসিয়া পড়িয়াছিল। কমলাও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল এবং আমার নিকট সে কথা প্রকাশ করিয়াছিল।

আমি ও কমলা অনেক পরামর্শ করিলাম। য়ক্ষ বাবু ছাড়িয়া দিলে কমলার কি দশা হইবে, আমারই বা কি হইবে তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হইল। কমলা বলিল—"তোমাকে আমি ছাড়তে পারব না। স্বামী সঙ্গ করেছি লৌকিক প্রথার অনুরোধে। দাদামহাশয় জোর করে আমার সঙ্গ করেছেন, তার সঙ্গে এবং য়ক্ষ বাবুর সঙ্গে থেকেছি স্বার্থের খাতিরে কিন্তু তোমায় আমি ভালবাসি ; এমন ভাল কাউকে বাসিনি, তুমি আমাকে ছাড়তে পারবে না।"

ছাড়িতে আমিও ইচ্ছুক ছিলাম না। কমলার স্কন্ধে ভর করিয়া আমার দিন বেশ সুখেই কাটিতেছিল। মাসিক বেতন ছাড়া যখন যাহা চাহিতাম, কমলার নিকট তাহাই পাইতাম। কিন্তু আমি কমলাকে প্রতিপালন করিব কি করিয়া? কমলাকে লইয়া দারিদ্র্য বরণ করিবার উপযুক্ত নভেলি প্রেম আমার ছিল না। অবশ্য সে কথা তাহাকে বলিলাম না। নাটকীয় ভাষায় আমার প্রেমই জ্ঞাপন করিলাম। শেষ পরামর্শ স্থির হইল যে কমলা সেই কুমার অনঙ্গনাথের স্কন্ধে চাপিতে চেষ্টা করিবে এবং আমাকেও তাহার সঙ্গে রাখিবে। হইলও তাহাই, আমারই হাতে কমলার পত্র পাইয়া কুমার বাহাদুর গোপনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দুই চার দিন রাত্রিতেও তাঁহার যাতায়াত হইল। আমিই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া মিলন করিয়া দিলাম। একদিন কমলা চমৎকার অভিনয় করিল। য়ক্ষ বাবু কুমারের আগমন জানিতে পারিয়া তাহাকে মারধর করিয়াছেন এবং আমি তাহার সহায়তা করিতেছি জানিতে পারিয়া আমাকেও জবাব দিয়াছেন—কাঁদিতে কাঁদিতে এই সকল কথা কুমার বাহাদুরকে বলিল। কুমার বাহাদুর সেই দিনই আমাকে নিযুক্ত করিলেন এবং একদিনের ভিতর একটি বাড়ি খুঁজিয়া নানা প্রকার আসবাব দ্বারা তাহা সাজাইবার আদেশ দিয়া

আমাকে একতাড়া নোট দিয়াছিলেন। পরদিনই পাখি যক্ষ বাবুর পিঞ্জর হইতে উড়িয়া গিয়া কুমার বাহাদুরের কুঞ্জে প্রবেশ করিল, পাখির পরিচারক হিসাবে আমিও প্রবেশ করিলাম।

কিছুদিন বেশ চলিল, এই সময় কমলার স্বামীর মৃত্যু হইল। কমলা সে সংবাদ পাইয়া বিশেষ কোন দুঃখ প্রকাশ করিল না, কিন্তু কুমার বাহাদুরের সঙ্গে কমলার বেশি দিন বনিবনাও হইল না। এবারে কমলা যাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তিনি বাংলা দেশে সুপরিচিত—গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুগৃহীত এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া কমলার আসবাব সাজসজ্জা ইত্যাদি সকলই উন্নত হইল। কমলা এখানেও আমাকে সঙ্গে আনিল, এখানকার বাড়িতে কর্মচারীরূপে আমি নিযুক্ত হইলাম, আমাদের মিলনে কোন বাধা হইল না।

কমলার এবারে আশ্রয়দাতা যিনি, আমরা তাঁহার নাম সংক্ষেপে এই আখ্যায়িকায় বিভাষচন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করিব। কমলাকে তিনি প্রকৃতই খুব ভালবাসিতেন। কমলার পূর্ব প্রণয়ীগণের মত ইহার ভালবাসা ক্ষণস্থায়ী হয় নাই এবং ইনি কেবল মাত্র কমলাকে লইয়াই ব্যস্ত না থাকিয়া তাহার কন্যাগুলিকে মানুষ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কমলা নানা প্রকার কলা-কৌশল করিয়া কন্যা তিনটিকে তাহার নিকটে আনিয়াছিল। কমলা সাধারণ বেশ্যার ন্যায় থাকিত না। আধুনিক শিক্ষিতা প্রগতিপ্রাপ্তা মহিলা হিসাবে থাকিত। যখন যেখানে বাড়ি লওয়া হইয়াছে, তাহা তাহার নামেই লওয়া হইত। তাহার প্রণয়ী যাঁহারা আসিতেন, তাঁহারা বন্ধু হিসাবে আসিতেন, প্রকাশ্যে কেহ কোন দোষণীয় ব্যবহার দেখিতে পাইত না। কন্যা তিনটিকে আনিয়া তাহাদিগকে ডায়সেসন স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। বিভাষচন্দ্র তাহার সমস্ত ব্যয় এবং মেয়েদের বোর্ডিংএ থাকার সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করিতে লাগিলেন। রবিবারের ছুটিতে মেয়েরা বাড়িতে আসিত।

বিভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার অনেক বন্ধু-বান্ধব কমলার বাড়িতে বেড়াইতে আসিতেন, তাহার মধ্যে জনৈক দেশনেতাও আসিতেন। ইনি প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়াছিল, তাহাদের পরবর্তী ব্যবহারে ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। প্রসিদ্ধ নেতার নাম আমরা মনতোষ বাবু বলিব।

পূর্বেই বলিয়াছি, কমলার মেয়ে তিনটি রবিবারের ছুটিতে বাড়িতে আসিত। ওই সময় বিভাষচন্দ্রের কোন বন্ধু-বান্ধব উপস্থিত থাকিলে মেয়েরা তাঁহাদের সঙ্গে গল্প গুজব করিত। মনতোষবাবু সাবিত্রীর সহিত একটু বেশি ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করিতে লাগিলেন। ইহা আমার এবং কমলার চক্ষু এড়াইল না ; কিন্তু বিভাষচন্দ্র কিছু টের পাইলেন না। কমলার ইহাতে আপত্তি লক্ষ করিলাম না, বরং সে উভয়ের নির্জনে মিশিবার সুযোগ ঘটাইয়া দিতে লাগিল। পশ্চাৎ জানিতে পারিলাম কমলা মনতোষবাবু হইতে যথেষ্ট টাকা লইয়া তাহার বিনিময়ে কন্যার রূপ-যৌবন বিক্রয় করিয়াছিল। সাবিত্রীর সঙ্গে মনতোষবাবুর মিলনের সুযোগ করিয়া দেওয়ার জন্য কমলা তাহাকে স্কুল ছাড়াইয়া বাড়িতে আনিল। কিছু দিন পর মনতোষবাবুর অভাবে কমলার চেষ্টা রহিল কন্যার জন্য একটি শিকার সংগ্রহ করা।

এখানে একথা বলা সঙ্গত যে, কন্যার সম্বন্ধে এই ব্যবহারের প্রতিবাদ আমি গোপনে কমলার নিকট না করিয়া পারি নাই। চরিত্রহীন হইলেও কন্যার সতীত্বের বিনিময়ে মাতার অর্থ উপার্জন, এই ব্যাপারটি আমার নিকট বড়ই বিসদৃশ এবং ঘৃণিত মনে হইয়াছিল। কিন্তু কমলা আমার কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিল। কমলার প্রতি আমার যে আকর্ষণ, আসঙ্গ-লিপ্সাই তাহার একমাত্র কারণ, তাহাতে ক্রমেই ভাটা পড়িয়া আসিয়াছিল। এই ব্যাপারে তাহার প্রতি একটা ঘৃণার ভাব হওয়ায় আমার সেই আকর্ষণ যেন আরও একটু শিথিল হইয়া আসিল।

এমন সময় কমলার চরিত্রের আর একটা দিক—এক অভূতপূর্ব ব্যাপার আমার চোখে পড়িল। দুইটি মুসলমান নেতার সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়া বিভাষচন্দ্রের হঠাৎ গুরুতর মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়া উঠিল। সংবাদপত্রের স্তম্ভ হইতে এই মনোমালিন্যের ব্যাপার আমরা কতকটা জানিতে পারিয়াছিলাম। বিভাষচন্দ্রের মুখেও কিছু কিছু জানিতে পারিয়া কমলা আমাকে বলিয়াছিল।

তাহার পর এই দুইটি মুসলমান নেতার লোক যখন বিভাষচন্দ্র উপস্থিত না থাকিতেন তখন আসিয়া কমলার সহিত দেখা করিতে লাগিলেন। কমলার সঙ্গে গোপনে তাঁহাদের কি কথাবার্তা হইতে লাগিল। কমলা সে সব কথা আমার নিকটও গোপন রাখিত। উক্ত দুই একজন মুসলমানের সহিত দুই চার দিন অন্য একজন মুসলমান আসিলেন—শুনিলাম তাঁহার নাম মৌলবী আবু হোসেন খাঁ, বনাম গারনার কি এমনই একটা ইংরাজি নাম। তিনি পেটেণ্ট ঔষধের ব্যবসা করিতেন। গর্ভ নিবারক এবং অন্যান্য অনেক প্রকার ঔষধ তাহার ছিল। ইতিমধ্যে কমলা দুই চার দিন কোথাও বাহির হইয়া গেল, বাড়ির গাড়ি না লইয়া ভাড়াটে ট্যাক্সি ডাকিয়া। এই সকল রকম-সকম দেখিয়া আমার খুব সন্দেহ হইতে লাগিল। আমি কমলাকে অনেক জেরা করিলাম। কমলা কোন উত্তর দিল না, কেবল হাসিতে লাগিল। শেষটায় এই বলিয়া আমাকে থামাইয়া দিল যে—সময় হইলে সবই জানতে পারবে। যাতে আর কারোর উপর নির্ভর না করে তোমায় আমায় স্বাধীনভাবে থাকতে পারি তারই ব্যবস্থা কচ্ছি। আমি আর কিছু বলিতে সাহস করিলাম না।

ইহার কিছুদিন পর এক রবিবার দুপুরবেলা বিভাষচন্দ্র কমলার শয়ন ঘরে ঢুকিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় হঠাৎ উপরের ঘরে একটা গোলমাল শুনিতে পাইয়া আমি দৌড়াইয়া উপরে গেলাম। যাইয়া দেখি বিছানার একপার্শ্বে বিভাষচন্দ্র বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় বসিয়া আছেন, অপর পার্শ্বে কমলা মাথা হেঁট করিয়া আছে, সম্মুখে গারনার ও অন্য কয়েকজন লোক ও একজন মৌলবী এবং আরও দুইজন মুসলমান ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন। আমি যাইয়া শুনিতে পাইলাম গারনার বলিতেছে—'আপনারা প্রমাণ থাকুন, বিভাষচন্দ্র আমার বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত অবৈধ সহবাস করিয়াছেন। আমি এজন্য আদালতে বিচারপ্রার্থী হইব।—"

আমি শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কমলা গারনারের বিবাহিতা স্ত্রী? আমি ব্যাপার

কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। উপস্থিত দুইজন মুসলমানের মধ্যে একজন বলিলেন—"ইনি যে আপনার বিবাহিতা স্ত্রী তাহার প্রমাণ কি? " গারনার উত্তর করিল—"এই দেখুন প্রমাণ।" এই বলিয়া বিবাহের যে দলিল হইয়াছিল তাহাও সকলকে দেখাইল।

গারনারের দল চলিয়া গেল, তারপর বিভাষচন্দ্রও চলিয়া গেলেন। কমলার সহিত আর একটি কথাও তিনি বলিলেন না এবং সেই ভবনে তাঁহার সেই শেষ পদার্পণ।

ইহার পর যে সকল ঘটনা ঘটিল তাহা আমি কমলার নিকটই জানিতে পারিয়াছিলাম। বিভাষচন্দ্রের উচ্চ পদ-মর্যাদা, দেশব্যাপী খ্যাতি এবং বংশ গৌরব রক্ষা করিবার জন্য তিনি বাধ্য হইয়া দশ হাজার টাকা দিয়া প্রকাশ্য আদালতে এই ব্যাপার যাহাতে না গড়ায় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ পক্ষের দাবী ছিল এক লক্ষ টাকা ; কিন্তু খুব বড় এক ব্যারিস্টার মাঝে পড়িয়া দশ হাজারে রফা করিয়া দেন। শুনিয়াছি, এই টাকাটা পূর্বোক্ত ওই মুসলমান, মৌলবী গারনার এবং কমলা ভাগ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু কমলা যে আশা করিয়া এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছিল তাহার সে আশা পূর্ণ হইল না। এই টাকার অতি সামান্য অংশই মাত্র সে পাইয়াছিল। কমলার জাতও গেল পেটও ভরিল না। বিভাষচন্দ্রের আশ্রয়ও হারাইল, স্বাধীনভাবে থাকিবার উপযুক্ত যে অর্থের আশা সে করিয়াছিল তাহাও পাইল না। গারনারের দ্বারা ভবিষ্যতে আর ওই প্রকার মিথ্যে দাবী যাহাতে না হয় তজ্জন্য একখানা "তালাক নামা" লেখাইয়া লওয়া হইয়াছিল। পাপের ফল গারনারকে পরে ভুগিতে হইয়াছিল। যাঁহারা সংবাদ-পত্রের নিয়মিত পাঠক তাঁহারা মৌলবীর মোকদ্দমার খবর রাখেন। মৌলবী গারনার বহুদিনের জন্য কয়েকবার কারাবরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার পর কমলার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। রেস্ খেলার বাতিকই তাহার সর্বনাশের প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইল। গোলদিঘি অঞ্চলের জনৈক ডাক্তার এবং পর্যটকের ভ্রাতা—যিনি আংটি বাবু বলিয়া খ্যাত, তাঁহার রক্ষিতা হিসাবে সে কিছুদিন রহিল ; কিন্তু কমলার খরচ যোগান আর প্রবাদোক্ত শ্বেতহস্তী পালন করা প্রায় এক প্রকার সমস্যাই ছিল। সুতরাং কিছুদিন পরে এই বেল্লিক বাবু পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন বলিলে ঠিক বলা হইল না, কমলাই তাহাকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে বাধ্য করিল—কারণ তাহার পোষাইতেছিল না। ইহার পর কমলা এক নূতন ফন্দি আবিষ্কার করিল। টেলিফোনে এক এক দিন এক একজন কাপ্তেন গোছ লোককে ডাকিয়া, তাহার মনোরঞ্জন করিয়া কিছু টাকা আদায় করিয়া লইত।

এই সময়ে একদিন কমলার বাড়িতে হঠাৎ পদ্মরঞ্জন সরকারের আবির্ভাব হয়। পদ্মবাবু সন্ধ্যার পর কমলার গৃহে আসেন। হঠাৎ পদ্মবাবুর সঙ্গে সাক্ষাত হওয়ায় তিনি ও আমি উভয়েই বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়িলাম ; কারণ আমরা পূর্ব-পরিচিত ছিলাম। ইতিপূর্বে পাঠকগণকে পদ্মরঞ্জন বাবুর কিছু পরিচয় দিয়াছি ; কিন্তু এই সময়ে তিনি আর সেই অখ্যাতনামা পদ্ম সরকার নহেন। এখন তিনি অনেক উচ্চপদস্থ। পদ্মরঞ্জনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের কাহিনি এবং তাঁহার কীর্তিকাহিনি স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে পাঠকগণকে বলিব। পদ্মরঞ্জনের দুর্ভাগ্য কমলা তাহাকে আমল দিল না,—'অপমান করিয়া তাড়াইয়া

দিল। আমি যখন কমলাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম এবং বেশ একটা মোটা দাও ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য তাহাকে আহম্মক বলিয়া ঠাট্টা করিলাম, কমলা তখন বলিল—"আমি বাজারের বেশ্যা নই, ওসব সরকার ফরকার আমার কাছে আসতে পারবে না।" এই অবস্থাতেও কমলার আভিজাত্য গৌরব দেখিয়া আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। ইহার পর কমলা ইটালী অঞ্চলের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, যাঁহার নাম আমরা কানাকড়ি ঘোষ বলিব, তাঁহার রক্ষিতা হয়। কয়লা ব্যবসায়ী কানাকড়ি বাবু একটি স্বতন্ত্র বাগান বাড়িতে দারোয়ান প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া খুব জাঁকজমকে কমলাকে রাখিলেন—বলা বাহুল্য আমি সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। কিন্তু কিছুদিন পর আংটিবাবু, যাঁহাকে কমলা তাড়াইলেও তিনি কমলার মোহ ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তিনি কয়েজন বন্ধু এবং অন্যান্য লোক লইয়া বাগান বাড়িতে প্রবেশ করেন। কানাকড়ি বাবুও কয়েকজন বন্ধুসহ তখন বাগান বাড়িতে ছিলেন। উভয় পক্ষে ভীষণ মারমারি হয় এবং থানায় উভয় পক্ষই ডায়েরি করেন। উভয় পক্ষেই কলিকাতার সম্ভ্রান্ত বংশের অনেক লোক ছিলেন। পরিশেষে কোন বিশিষ্ট ইংরেজ ভদ্রলোকের মধ্যবস্থায় ওই গোলামাল আর আদালত পর্যন্ত গড়াইতে পারে নাই। ওই ইংরেজটি নাকি 'স্যার' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কমলার ইতিহাস আমি আর বাড়াইতে চাই না। তাহার কন্যাদের সম্বন্ধে গোটা কতক কথা বলিয়াই আমি এই কাহিনি শেষ করিব। কমলার ইচ্ছা—তিনটি কন্যাকেই তাহার কাছে টানিয়া লইয়া, তাহাদের উপার্জন দ্বারা নিজের বিলাসিতার ব্যয় নির্বাহ করে। সাবিত্রীকে সে সেই পথে লইয়াও ছিল। তাহার পর সাবিত্রীকে কমলা একজন দেশিয় বৃদ্ধ এবং ধনী খ্রিস্টানের সঙ্গে কল কৌশল করিয়া বিবাহ দেয়। তাহার আশা ছিল বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা হইলে, সে ভার্যার মাতা হিসাবে বৃদ্ধ জামাতার সিন্ধুকের উপর তাহার অপ্রতিহত ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু বিবাহের পরে দেখা গেল, কমলা হিসাবে ভুল করিয়া বসিয়াছে। জামাতা বাবাজি শাশুড়িকে মোটেই আমল দিতে ইচ্ছুক নহেন। তখন সাবিত্রীকে ফুসলাইয়া বাহির করিয়া আনিয়া সে করপোরেশন স্ট্রীটে অনিল মারের সুড়োর বাগানে কিছু দিন রাখিল। জামাতা বাবাজিও ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তিনি কমলার নামে মোকদ্দমা করিলেন। কিন্তু মোকদ্দমায় কমলাকেই হারিতে হইল। সাবিত্রী তাহার স্বামীর ঘরে ফিরিয়া গেল। ইহার পরও কমলা আর একবার সাবিত্রীকে আনে ; কিন্তু বৃদ্ধ খ্রীস্টান ওয়ারেণ্ট দ্বারা তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। বার বার কমলার এই সকল ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া বৃদ্ধ শেষে "যঃ পলায়তি সঃ জীবতি" নীতির অনুসরণ করিতে বাধ্য হয় এবং কলিকাতার বাস উঠাইয়া স্ত্রীকে লইয়া মধুপুর চলিয়া যায়। সেখানেই তাহারা এখনও বাস করিতেছে।

গোবরেও পদ্ম ফুল ফুটে—দৈত্যকুলেও প্রহ্লাদ জন্মিয়া থাকে। কমলার ছোট কন্যাটি হইয়াছিল তাহাই। সে অত্যন্ত তেজস্বিনী ছিল। কমলা বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বিপথে টানিতে পারে নাই। মাতার চেষ্টার সঙ্গে আরও বহু কাপ্তেনবাবুর চেষ্টা তাহার সর্বনাশের

জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল। কিন্তু সে আপন তেজস্বীতায় নিজের চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। কলিকাতার কয়েকজন অল্প-বয়স্ক ব্যারিস্টার তাহার নিকট অসৎ প্রস্তাব করিয়া পাদুকা প্রহারে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। ইটালী অঞ্চলের জনৈক রায়বাহাদুর, যাঁহার নাম আমরা দেবেশচন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করিব, তাঁহার উপযুক্ত লায়েক পুত্র একদিন প্রাচীর টপকাইয়া প্রেম করিতে যাইয়া কানাকড়ি ঘোষের হাতে বেদম প্রহার লাভ করেন। পরে পরিচয় পাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কন্যাটি এই সকল অত্যাচারে অতিষ্ঠা হইয়া মাতৃগৃহ পরিত্যাগ করে এবং তাহার পিতৃবংশের বন্ধু, জনৈক কায়স্থ-বংশীয় সচ্চরিত্র যুবকের সঙ্গে বিবাহিত হয়। এই ব্যক্তি মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে চাকুরি করিত। অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। কায়স্থ কন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়াই যুবক নব বধূকে বাড়িতে লইয়া যায়। যুবকটির মাতা বধূর গৃহকার্য এবং চরিত্রে মুগ্ধা হইয়াছিলেন। বধূর গুণে প্রতিবেশীরা পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার অদৃষ্টে এই সুখ শান্তি, এই আদর যত্ন, স্বামীর এই প্রাণভরা ভালাবাসা বেশি দিন ভোগ করা ঘটে নাই। সকলকে কাঁদাইয়া যক্ষ্মা রোগে সে অকালে প্রাণ বিসর্জন করে।

কমলার অপর কন্যা সুকৃতির কথা এখন বলিব। এই কন্যাটির পরিচয় দিবার পূর্বে আর এক ব্যক্তির পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ইনি দক্ষিণ কলিকাতার সম্ভ্রান্ত অর্ধ -ব্রাহ্মণ বংশের এক চরিত্রবান যুবক। কমলার স্বামী ও পিতার বংশের সহিত ইহার বন্ধুত্ব ছিল। ইনি মাঝে মাঝে কমলার খোঁজ খবর লইতেন। ইহার চেহারাটি যেমন সুন্দর, স্বভাবটিও তেমনি মধুর এবং নম্র ছিল। আমি ভদ্রলোকের ছেলে, এম. এ. পাশ করিয়া নিতান্ত অভাববশত এই চাকুরি করিতেছি মনে করিয়া ইনি আমার সঙ্গে একটু সহানুভূতিসূচক ব্যবহার করিতেন। কমলা যখন অভাবে পরিত, তখন ইনি তাহাকে অনেক টাকা ধার বলিয়া দিতেন, প্রকৃত পক্ষে তাহা দান, ধার নহে। কমলার কন্যা সুকৃতিও ডায়সেসন স্কুলে পড়িত। সুকৃতি যখন জুনিয়র কেম্‌ব্রিজ পাশ করে, তখন খরচ চালান অসম্ভব বলিয়া কন্যা দ্বারা অর্থোপার্জন করিবার ইচ্ছায় কমলা তাহাকে পড়া ছাড়াইয়া আনিতে চায়, কিন্তু সুকৃতি এই যুবককে তাহার পড়ার খরচ চালাইতে অনুরোধ করায় তিনি সেই খরচ চালাইতে ছিলেন। এই যুবকটি যেমন অর্থশালী, তেমনি কবি ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। কয়েকখানা মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজের তিনি সম্পাদকতা করিয়াছেন। সুন্দর সুন্দর কবিতা তিনি লিখিতে পারেন [?]। সুকৃতি তাঁহার কবিতার খুব ভক্ত ছিল। সুকৃতি অসামান্য সুন্দরী। তাহার শরীরের রং ইউরোপীয় মহিলাদের ন্যায়। কলিকাতার কয়েকটি একজিবিশনে (কার্নিভ্যাল এবং ফ্যান্সি ফেয়ার) সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় সে অনেকবার প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে। সুকৃতির ফটো-চিত্র পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল, তাহা দেখিলেই বোঝা যাইবে যে সে নিখুঁত সুন্দরী। এই যুবক—যাহাকে আমরা কবি বলিয়া উল্লেখ করিব—প্রকৃতপক্ষে সচ্চরিত্র ছিলেন এবং সুকৃতিকে ভগ্নীর ন্যায় ভালবাসিতেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল সুকৃতি লেখাপড়া শিখিয়া উপযুক্ত পাত্রে বিবাহিত হয়।

কিন্তু কমলার ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। সে হঠাৎ একদিন সুকৃতিকে কলেজ হইতে নাম কাটাইয়া বাড়িতে লইয়া আসে এবং কয়েকদিন পরেই কোন একজন কাপ্তেন বাবুর সহিত তাহাকে জুটাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করে, সুকৃতি তাহাতে অস্বীকৃত হয়। কমলাও কাঁদাকাটি, লোভ প্রদর্শন, পরিশেষে উৎপীড়ন করে, কিন্তু কিছুতেই মেয়ের মন টলাইতে পারে নাই। কমলার অপর দুই কন্যার প্রতি ব্যবহারেই তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা কমিয়া আসিয়াছিল, পূর্বেই তাহা বলিয়াছি। এই সুন্দরী কন্যাটিকেও নষ্ট করিবার চেষ্টা দেখিয়া মর্মাহত হইলাম এবং কমলার সহিত এই ব্যাপার লইয়া আমার বেশ একটা ঝগড়া হইয়া গেল। সুকৃতি সেই ঝগড়ার ফলে বুঝিতে পারিল যে আমি তাহার পক্ষে। তখন গোপনে কবিকে সংবাদ দিলাম। কবি আসিয়া তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, পুনরায় মেয়েকে কলেজে দিতে জেদ করিলেন। কিন্তু কমলা তাঁহার কোন কথা শুনিল না। কবির নিকট প্রাপ্ত এতদিনের উপকার বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে এমন অপমানজনক কথা শুনাইয়া দিল, যাহাতে কবি তৎক্ষণাৎ সেই বাড়ি ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুদিন এই ভাবে চলিবার পর কমলার উৎপীড়নের মাত্রা বাড়িয়া গেল। সে প্রত্যহ সুকৃতিকে মারধর করিতে লাগিল। সুকৃতি যাহাতে পলাইতে না পারে সেজন্য কমলা একজন হিন্দুস্থানি ঝি নিযুক্ত করিল। সুকৃতি আমার দ্বারা কবির নিকট গোপনে তাহার অবস্থা বর্ণনা করিয়া আর একখানা পত্র পাঠাইয়া দিল। তাহার শেষ অংশে লেখা ছিল, "আমাকে এই নরক হইতে রক্ষা করুন।" কবি আবার আসিলেন, কমলাকে আবার বুঝাইলেন। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি আটটা পর্যন্ত অনেক তর্কবিতর্ক হইল, কবি অনেক অপমানসূচক কথা সহ্য করিলেন, অবশেষে বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় আমাকে বলিলেন—"আমি আর কি করিতে পারি বলুন?" আর বিলম্ব করিবার সময় নেই,—আমার বন্ধু গ্রে স্ট্রীটের অমুক দেবের বাড়িতে আজ নিমন্ত্রণ, সেখানে এখনই যেতে হবে। আর একদিন এসে আবার চেষ্টা করব। যে বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণের কথা বলিলেন তাহা আমাদের বাড়ি হইতে বেশি দূরে নহে। আমি কবিকে বিদায় দিয়া সুকৃতি যে ঘরে ছিল তথায় গিয়া তাহাকে সকল কথা বলিলাম।

রাত্রি প্রভাত হইলে সুকৃতিকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ক্রোধে কমলা যেন রাক্ষসীর মূর্তি ধারণ করিল, নিজে গাড়ি লইয়া নানাস্থানে খুঁজিতে বাহির হইল। আমাকে কবির বাড়িতে অনুসন্ধান করিতে পাঠাইল।

আমি কবির বাড়িতে যাইয়া তাঁহার নিকট যে কথা শুনিলাম তাহাতে বিস্মিত ও আনন্দিত দুইই হইলাম। তিনি বলিলেন যে, সে দিন দেব-বাবুর বাড়ির নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া গাড়িতে উঠিতেই দেখেন গাড়ির মধ্যে সুকৃতি বসিয়া আছে।

তিনি সুকৃতিকে তাহার মাতার নিকট লইয়া যাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু মা'র বাড়িতে ফিরিয়া না যাওয়ায় তিনি বাধ্য হইয়া দমদমের বাগান বাড়িতে রাখিয়াছেন। সুকৃতি এক কাপড়ে বাহির হইয়াছিল সুতরাং সেই রাত্রেই তাহার আবশ্যকীয় কতকগুলি

জিনিসপত্র কিনিয়া তাহাকে বাগানে রাখিয়া তবে রাত্রি প্রায় দু'টায় কবি গৃহে ফিরেন। তিনি বলিলেন—"আমি তাহাকে নিজ বাড়িতেই আনিতাম কিন্তু আমার স্ত্রীর, মন অত্যন্ত সন্দিগ্ধ তাই সাহসী হই নাই।"

আমি চলিয়া আসিলাম ; কোন খবর পাওয়া গেল না বলিয়াই কমলার নিকট প্রকাশ করিলাম। কমলা ক্রুদ্ধা সিংহিনীর ন্যায় গর্জন করিতে লাগিল এবং পুলিশে কবির নামে ডায়েরি করিল যে তাহার নাবালিকা কন্যাকে কবি ফুসলাইয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছেন। আমি কোন ছুতা করিয়া বাগান বাড়িতে যাইয়া কবি ও সুকৃতিকে দেখিতে পাইলাম। ডায়েরির কথা তাঁহাদের দু'জনকেই বলিলাম। কবি অত্যন্ত ভয় পাইলেন বটে, কিন্তু সুকৃতি ছিল নির্ভীক। সে ম্যাজিস্ট্রেটের বরাবর একখানা দরখাস্ত লিখিয়া পাঠাইল। তাহার মর্ম এই প্রকার ছিল—

"আমার বয়স আঠার বৎসরের উপর। আমার মাতা অসৎ কার্য দ্বারা অর্থোপার্জন করাইতে আমাকে তাঁহার নিকট রাখিতে চান ; তাহাতে আমি রাজি না হওয়ায় আমার উপর শারীরিক নির্যাতন করেন ; তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া আমি স্বেচ্ছায় তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। আমি স্বাধীন ও সদ্ভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিবার জন্য স্বেচ্ছায় চলিয়া আসিয়াছি ; ইহার জন্য অপর কেহ দায়ী নহেন, আমি নিজেই দায়ী। আমি যে লেখাপড়া শিখিয়াছি, তদ্দ্বারা আমার নিজের জীবিকা উপায়ের ক্ষমতা আমার আছে।"

পত্রখানা ইংরাজিতেই লিখিল। আমরা তিনজনে পরামর্শ করিলাম যে কমলা যখন সন্দেহ করিয়াছে, তখন আজ হোক আর কাল হোক, কি দু'দিন পরেই হোক—এই বাগান বাড়িতে সে সুকৃতির অনুসন্ধানে নিশ্চয়ই আসিবে ; সুতরাং বাগান বাড়ি সেই দিনই ত্যাগ করা উচিত। সেই দিনই কবি বৌবাজার স্ট্রীটে একটি প্রকাণ্ড বাড়ির একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়া সুকৃতিকে সেখানে লইয়া গেলেন।

তাহার পরদিন কমলা সকাল বেলা বাহির হইয়া গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিল—"সুকৃতিকে কবিই লইয়া গিয়াছে। আমি বাগানে গিয়াছিলাম—সেখানে মালি দারোয়ান যাহারা ছিল, তাহারা অস্বীকার করিল বটে, কিন্তু সেখানে সুকৃতির পরিহিত কাপড়খানা শুকাইতেছিল—সুকৃতিকে তাড়াতাড়ি অন্যত্র সরাইয়াছে ; কিন্তু ভুলে কাপড়খানা তথায় ফেলিয়া গিয়াছে—তাহা দেখিয়াই আমি টের পাইয়াছি। দারোয়ান এবং মালি সুকৃতির বিষয় অস্বীকার করায় সঙ্গের লোক দ্বারা তাহাদের বেশ দু'ঘা দিয়াও স্বীকার করাইতে পারি নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি এখন কি করিতে চাও?"

কমলা বলিল—"চল আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করব।"—এই বলিয়া আমাকে এবং রাস্তা হইতে চারিজন গুণ্ডা সঙ্গে লইয়া রাত্রি প্রায় দশটার সময় সে কবির বাড়িতে যাইয়া উপস্থিত হইল। কবি উপরে ছিলেন, সংবাদ দেওয়ায় নীচে আসিলেন। তিনি ব্যাপার

বুঝিতে পারিলেন কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া কমলাকে বলিলেন—"একি, আপনি এত রাত্রিতে হঠাৎ কি মনে করে?"

কমলা সক্রোধে ব্যঙ্গ সুরে বলিল—"আহা ন্যাকা আর কি? কি মনে করে? কিছুই যেন জানেন না। সুকৃতিকে কোথায় রেখেছ বল?"

কবি সে সম্বন্ধে কিছুই জানেন না বলিলেন—কমলার সঙ্গে কবির ভীষণ বচসা আরম্ভ হইল। কমলা উত্তেজিত হইয়া তাহার হস্তস্থিত রাইডিং চাবুক দ্বারা কবিকে প্রহার করিতে গেল। আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরায় ব্যাপারটা অতদূর গড়াইল না। কবি এই ব্যাপারে বেশ ধৈর্য রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কেবল মাত্র বলিলেন—"আপনি স্ত্রীলোক এবং আমার বাড়িতে এসেছেন, সেই জন্যই আপনি আমাকে যে অপমান করলেন সেটা আমাকে সইতে হ'লো। আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। যদি ভেবে থাকেন যে আপনার মেয়ে আমার কাছেই আছে তা হ'লে আইন মত যা করতে পারেন করবেন।"

কমলা গর্জন করিতে করিতে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল—"আমি তোমাকে বিশেষ শিক্ষা দিব।"

ইহার পর হইতে কবির বাড়িতে যাইয়া কমলা মাঝে মাঝে উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল। গুণ্ডা দিয়া কবিকে প্রহার করিতেও চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। আমিই সময় থাকিতে গোপনে কবিকে সতর্ক করিয়া দিতাম। অনেক দিন কবি বাড়ি হইতে বাহির হইলে কমলা মোটরে তাহার পশ্চাদানুসরণ করিত ; কবি খুব সাবধানে থাকিতেন। কমলা বৌবাজারের বাসার ঠিকানা আবিষ্কার করিতে পারিল না।

সুকৃতি নাকি বউবাজারে ওই ফ্ল্যাটে এককিনী থাকিতে ভয় পাইত। একদিন আমি যখন গোপনে ঐ ফ্ল্যাটে গিয়াছি তখন কবি আমাকে এই কথা বলিলেন—পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, ঐ ফ্ল্যাটের উপরের ফ্ল্যাটে একটি মেম সাহেব থাকিতেন তিনি সুকৃতির নিকট থাকিবেন।

কয়েকদিন মেম সাহেব থাকিবার পর সুকৃতির একছড়া মূল্যবান হার চুরি গেল। সুকৃতি মেম সাহেবকে সন্দেহ করিল। মেম সাহেবের রাত্রিতে থাকা বন্ধ হইয়া গেল। এদিকে কমলা থানায় যে ডায়েরি করিয়াছিল তাহা লইয়া পুলিশ কোন প্রকার গোলামাল না করে তজ্জন্য পুলিশের মুখ বন্ধ করিতে কবি পাঁচশত টাকা ব্যয় করিলেন।

কমলার দৈনিক অত্যাচার, অপর দিকে অর্থ ব্যয়, তারপর বাড়িতেও সন্দেহের ফলে অশান্তি—এই ত্র্যহস্পর্শ যোগে কবির প্রাণান্ত হইয়া উঠিল। কবি তখন পর্যন্ত লম্পট ছিলেন না, কাজেই কেবল একটি মেয়ে, সে যতই সুন্দরী হউক না কেন, কেবল তাহার উপকারের জন্য এত অশান্তি তিনি ভোগ করিতেছেন, ইহা জানিয়া আমি তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারি নাই।

কিছু দিন পর কবি হঠাৎ একদিন সুকৃতিকে লইয়া তাহার মাতার নিকটে উপস্থিত হইলেন। সুকৃতি কাঁদিতেছিল—কবি কমলাকে বলিলেন—"আপনার কন্যাকে আমি জোর

করিয়া লইয়া আসিয়াছি। আমি ইহাকে ভগ্নীর মত ভালবাসি, তাই ইহার জন্য এতদিন যথেষ্ট করিয়াছি কিন্তু সমাজে আমার একটু সম্মান প্রতিপত্তি আছে, এই ভাবে আমি ইহাকে রাখিতে পারি না। লোকে আমার প্রকৃত মনের ভাব বুঝিবে না, আমার দুর্নাম রটনা করিবে। আপনি একে রাখুন এবং এখনও আমার অনুরোধ, আপনি ইহাকে কলঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিবেন না। ইহাকে লেখাপড়া শিখাইয়া সদ্ভাবে জীবনযাপনের পথ করিয়া দিন।"

এই কথা বলিয়া কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া কবি চলিয়া গেলেন। কমলা মেয়েকে খুব আদর যত্ন করিল কিন্তু মেয়ে কেবলই কাঁদিতে লাগিল। দুইদিন চলিয়া গেল। সুকৃতি বহু সাধ্যসাধনাতেও জল গ্রহণ পর্যন্ত করিল না। সে বলিল, কবির নিকট তাহাকে থাকিতে না দিলে সে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে।

কমলা ভয় পাইয়া গেল। আমাকে পাঠাইয়া কবিকে আবার ডাকাইয়া আনিল। কবি আসিয়া অনেক বুঝাইলেন। কমলা প্রতিশ্রুতি দিল যে সুকৃতি তাহার বাড়িতে থাকিলে সে কোন অসৎ কার্য করিতে বলিবে না। সুকৃতি বলিল, তিনি যদি তাহাকে লইয়া না যান তাহা হইলে যে অনাহার সে আরম্ভ করিয়াছে, সেই অনাহারেই প্রাণত্যাগ করিবে।

উপায়ন্তরহীন হইয়া কবি আবার সুকৃতিকে লইয়া গেলেন। এবার সুকৃতির মাতা আর আপত্তি করিল না। সুকৃতি বাগান বাড়িতেই থাকিতে লাগিল। কমলা ও আমি মাঝে মাঝে যাইয়া দেখিয়া আসিতাম। কবির সহিত এই সময় আমার হৃদ্যতা খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তিনি অকপটে বলিলেন—"রমেশবাবু, আমি কি করবো বলুন তো? হৃদয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমি ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়েছি। আমি ভগবান সাক্ষী করে বলতে পারি, সুকৃতিকে ত আমি ভগ্নীর মতই দেখতাম, সেও আমাকে ভায়ের মতই ভালবাসে, আমার এই ধারণা ছিল। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পাচ্ছি ব্যাপারটি তা নয়! সে আমাকে অন্যভাবে ভালবাসে, আকার ইঙ্গিত হাবভাবে প্রত্যহ সে কথা বুঝিয়ে দিচ্ছে এবং সে-কথা বোঝাবার পর থেকে আমিও নিজের অজ্ঞাতে পূর্বভাব ভুলে গিয়ে তা'র দিকে সেই ভাবে আকৃষ্ট হচ্ছি। প্রত্যহ তার সঙ্গে এ ভাবে সাক্ষাৎ হ'লে আমাকে মনুষ্যত্ব হারাতে হবে। কি করে তাকে দূরে রাখতে পারি আমায় বলুন।"

আমি আর কি বলিব! সুকৃতির হাবভাব দেখিয়া আমি অনেক পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম। ইহার পরিণাম যে এই প্রকার দাঁড়াইবে তাহা আমার বুঝিতে বাকি ছিল না। কয়েকদিন পর কবি ও সুকৃতির সঙ্গে দেখা করিতে গেলে কবি বলিলেন—সুকৃতিকে তাহার মাতুল ও খুড়ার নিকট রাখিবেন বলিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, সে-চেষ্টাতেও বিফল মনোরথ হইয়াছেন। সুকৃতি বিশুদ্ধ চরিত্র আছে একথা তাঁহারা কেহই বিশ্বাস করেন নাই। সুকৃতিকে স্থান দিলে তাঁহাদের নিজেদের অবিবাহিতা কন্যাদের তাঁহারা বিবাহ দিতে পারিবেন না, এই কথাই বলিয়া দিয়াছেন এবং কবিকে কিছু অপমানজনক কথাও

বলিয়াছেন। সুকৃতি বলিল—"আমি ওকে আগেই নিষেধ করেছিলাম। উনি আমার কথা না মেনে মিছামিছি অপমানিত হলেন।"

যাহা হউক সুকৃতিকে অন্য কোথাও রাখিবার চেষ্টা সেই হইতেই শেষ হইল। কমলার সঙ্গেও এ বিষয় আমার মাঝে মাঝে আলাপ হইত। কমলা বলিত—"মেয়ে আমার সতী হয়েছেন। আমিও দেখছি সতীপনা ক'দিন থাকে, ওই পোড়ার মুখোর রাঙা মুখ দেখে মজেছে। পোড়ামুখীর একটু লজ্জাও নেই। কত লোক টাকা পয়সা ঢেলে খোশামোদ কচ্ছে তাদের দিকে তাকাবেও না। যে ফিরেও চায় না, তার গায়ে পড়া হয়ে থাকবেন।"

তারপর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—"তুমি দেখে নিও আমি বলে রাখছি—ওই পোড়ামুখোর এমন ভাব আর বেশি দিন থাকবে না। বেহায়া মেয়েটা যে ভাব আরম্ভ করেছে তাতে যাদুধনকে তার খপ্পরে পড়তেই হবে।"

আমি ঠাট্টা করিয়া বলিলাম—"না পড়ে কি উপায় আছে? তোমারই মেয়েতো। তা তুমি এত চটছো কেন, তুমিও তো তাই চাও।"

কমলা বলিল—"চাই—কিন্তু ও পোড়ারমুখোর সঙ্গে চাই না। যাদের কাছে গেলে ও সুখে থাকতে পেত, আমিও দুপয়সা করে নিতে পারতুম, তাদের সঙ্গে ও জুটতো—আমি তাই চেয়েছিলুম।"

আমি বলিলাম—'তা আর কি করবে বল? "যাতে যার মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম। আর দেখ—যদি একজনের কাছে চিরদিন ভদ্র ভাবে থাকতে পারে সেইতো ভাল।"

কমলা গর্জিয়া উঠিয়া বলিল—"তুমি একটা আস্ত বেকুব, একজনের কাছে ও থাকবে—তেমন রক্তেই ওর জন্ম নয়। তুমি দেখে নিও, এখন একটা চোখের নেশায় ওকে চাচ্ছে, বাছাধনকে হাত করে নিক, তখন দেখবে আর ভাল লাগবে না। তখন আবার অন্যলোক খুঁজবে। লাভের মধ্যে রোজগারের সময় ক্রমেই ফুরিয়ে আসবে।"

কমলার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইল। কিছুদিন পরেই কবি আমার নিকট স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে সুকৃতির সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক নির্দোষ নহে। ক্রমে সুকৃতির নেশা ছুটিয়া আসিল। তাহার গর্ভে একটি কন্যা জন্মিল। এই মেয়েটির নাম পূর্ণিমা সেন, এখন তাহার বয়স ৮।৯ বৎসর, সে স্কুলে পড়ে, দেখিতে বেশ সুশ্রী। কমলা এই সময় চেষ্টা করিতে লাগিল কন্যার মন বিগড়াইয়া দিতে। সুকৃতির নেশা এই সময় কমিয়া আসিতেছিল বটে কিন্তু কবির নেশা বাড়িয়া উঠিতেছিল। সুকৃতির সংবাদ তাঁহার বাড়িতে পৌঁছিয়াছিল এবং বাড়িতে সন্দিগ্ধচিত্তা স্ত্রীর নিকট হইতে তিনি যথেষ্ট গঞ্জনা ভোগ করিতে লাগিলেন। শান্তির আশায় তিনি সুকৃতির নিকট ছুটিয়া আসিতেন কিন্তু সুকৃতি এখন প্রায় সময়ই তাহার মাতার নিকট যাইত, তিনি সুকৃতিকে বাড়িতে পাইতেন না। এই সময় সুকৃতির জন্য কলিকাতাতেই একখানা বাড়ি করা হইয়াছিল।

সুকৃতির মাতা সুকৃতিকে নানাপ্রকার কুপরামর্শ দিতেছিলেন, একথা আমি কবিকে না জানাইয়া পারি নাই। কবি সুকৃতিকে তাহার মাতার বাড়িতে যাওয়া নিষেধ করিয়া দিলেন।

সুকৃতি প্রথমত স্বীকৃত হইল কিন্তু লুকাইয়া আসিতে লাগিল। কবির তখন ধৈর্যের সীমা অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি সুকৃতিকে জানাইয়া দিলেন যে তাঁহার সহিত তাহার সম্পর্ক শেষ হইল। সুকৃতি তখন তাহার অপরাধের জন্য মার্জনা চাহিয়া একখানা পত্র আমার দ্বারা কবির নিকট পাঠাইয়া দিল। কবি জানিতে পারিয়াছিলেন যে তাহার মাতার চেষ্টায় সে বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ী 'বলটু বাবুর' অঙ্কশায়িনী হইয়াছে। তিনি সুকৃতির পত্রখানি পড়িয়া রাগে আমার গায়ে ছুড়িয়া মারিয়া আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন। আমি পত্রখানা কুড়াইয়া লইয়া চলিয়া আসিলাম। সেই পত্রখানা এখনও আমার নিকট আছে। এই পুস্তকে তাহা ব্লক করিয়া দেওয়া হইল। [বর্তমান সংস্করণে কোনও চিঠির ব্লক নেই।]

সুকৃতির কথা এখন আমি সংক্ষেপেই শেষ করিব। সুকৃতি তাহার মাতৃপদানুসরণ করিয়াছে। বলটু বাবুর নিকট কিছুদিন থাকিবার পর বাবা ভোলানাথের কৃপায় সে এক বৃদ্ধ ধনীর অঙ্কশায়িনী হইয়াছিল। ধনীটি বড় কৃপণ ছিলেন—তিনি যে টাকা দিতেন তাহাতে কন্যা ও তাহার মাতা সন্তুষ্ট হইতেন না, এজন্য সুকৃতি তাহাকে ছাড়িয়া কিছুদিন সোনাগাছিতে ছিল। কবি ব্যতীত অপর দুইজন বৃদ্ধ বলিয়া বর্তমানে সুকৃতি সেন শর্মা বংশীয় 'গোপীকা' নামক এক যুবকের নিকট আছে।

গোয়ালিয়র এস্টেটের টী, প্রধান, নামক এক ইন্‌জিনিয়ার তাহার এক বন্ধুর সাহায্যে সুকৃতিকে দেখিয়া মোহিত হন এবং সুকৃতিকে গোয়ালিয়র লইয়া যাইবেন স্থির হয়। তিনি সুকৃতিকে মাসিক অর্থ পাঠাইতেন এবং সুকৃতির সঙ্গে প্রেমালাপ করিবার জন্য বাংলা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুকৃতি তাঁহার টাকাই লইয়াছিল কিন্তু প্রতিদান কিছুই দেয় নাই। প্রতিদানের ইচ্ছাও ছিল না কিন্তু অর্থ গ্রহণ করিত। এইভাবে কত লোক যে প্রতারিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

সুকৃতির কথা এইখানেই শেষ করিব। কবির কথা এখন আর একটু বলা প্রয়োজন! কবির সহিত আমার এখনও বন্ধুত্ব আছে এবং তাঁহার জন্য আমার বাস্তবিক দুঃখ হয়।

আমি নিজে জন্মাবধি অসৎ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; কিন্তু এই বেচারাকে দশচক্রে ভগবানভূত হইতে হইয়াছিল। চরিত্রহীনতার প্রতি বাল্য হইতে অশ্রদ্ধা থাকিলেও সময়চক্রে তাহাকে চরিত্রহীন হইতে হইয়াছে। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি সন্দিগ্ধচিত্তা অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রী গৃহে না থাকিয়া যদি সরলা সুশীলা এবং প্রেমময়ী স্ত্রী তাঁহার ভাগ্যে ঘটিত তাহা হইলে তাঁহার আত্মরক্ষা করা কঠিন হইত না। একদিকে বাক্য জ্বালা অন্যদিকে সুন্দরী রমণীর প্রেমপূর্ণ আত্মদান, এই দুইটির মধ্যে মানুষের ঠিক থাকা খুবই কঠিন। কবির সতী সাধ্বী স্ত্রীর জন্যও আমরা দুঃখিত, তিনি স্বামীকে ভাল করিবার চেষ্টাই করিয়াছেন কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

সুকৃতিকে তাড়াইয়া কবি কিছুদিন বড়ই উন্মনস্ক ভাবে ছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি গৃহে তাঁহার শান্তি ছিল না, কিন্তু তিনি শান্তি পাইয়াছেন জানিয়াছি। তাঁহার অপর প্রিয়ার নাম

গৌরী দেবী, ইনিও পরমা সুন্দরী। ইনি বৈদ্যবংশীয় এক উচ্চ পদস্থ চাকুরের কন্যা, বেথুন কলেজের ছাত্রী ও শিক্ষিতা। পিতামাতার একপ্রকার সম্মতি অনুসারেই ইনি কবির সঙ্গে মিলিতা হইয়াছেন। পিতা মাতার বাড়ির অতি নিকটে স্বতন্ত্র বাড়ি করিয়া কবি ইহাকে রাখিয়াছেন। কবি এবং ইনি উভয়েই বলেন যে তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছে। সেটা কি জিনিস তাহা আমার ধারণা নাই, পণ্ডিতগণ তাহা বিচার করিবেন।

কবির পর-পর কয়েকটি রমণীর সঙ্গে ভালবাসা হয় এবং বর্তমানে রেণু দেবী নাম্নী এক ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। এই দেবীটি কালু ঘোষের লেনে আছেন। অনেক সময় কবির মোটর এই রাস্তায় দেখা যায়।

কবির কথা এখানেই শেষ করিলাম। কমলার ফটো হইতে ব্লক করিয়া তাহার প্রতিমূর্তিও আমি এই পুস্তকে দিয়াছি। কমলার হস্ত লিখিত একখানা পত্রও ব্লক করিয়া দিলাম। এই পত্রখানার সঙ্গে একটা ইতিহাস জড়িত আছে। কাণাকড়ি ঘোষের রক্ষিতা অবস্থায় উত্তর বঙ্গের জনৈক রাজা বাহাদুর কমলার ইতিহাস শুনিয়া তাহাকে পাওয়ার জন্য লালায়িত হন। তাঁহার একজন কর্মচারী আমার নিকট আসে। কমলার রূপের জন্য যতটা নহে, কমলা কলিকাতার একটি বিখ্যাত বংশের কন্যা, তাহাকে অঙ্কশায়িনী করিতে পারিলে লম্পট জগতে খুব বড় একটা কীর্তি (Achievement) হইবে, এই ধারণা হইতে রাজা বাহাদূর কমলার দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। কমলা প্রকৃতই ঐ বংশের কন্যা কিনা অনুসন্ধান করিবার জন্য কর্মচারীটিকে পাঠাইয়াছিলেন। সেই সময় কমলা এই পত্রখানা লিখিয়া আমার দ্বারা রাজাবাহাদুরকে পাঠাইয়াছিল। দুঃর্ভাগ্যক্রমে যে দিন আমি ওই পত্র লইয়া রাজা বাহাদুরের নিকট গিয়াছিলাম সেই দিন প্রাতঃকালে তাঁহার পুত্রের অসুস্থতার টেলিগ্রাম পাইয়া রাজাবাহাদুর চলিয়া যান, পত্রখানা আর আমি কমলাকে ফিরাইয়া দেই নাই, আমার নিকটেই ছিল। রাজাবাহাদুর কিছুদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া কমলার সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি রক্ষিতাভাবে কমলাকে রাখেন নাই। দুই তিন দিন বাড়িতে ও বাগানে লইয়া গিয়াছিলেন।

কমলার সঙ্গে আমার ক্রমে বনিবনাও কম হইতে লাগিল, তাহার ব্যবহারে আমি শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলাম। কমলা প্রথমে যতই আমার প্রতি ভালাবাসা দেখাক না কেন, তাহার আকর্ষণে ভাটা পড়িয়া আসিতেছিল। কমলার নিকট কয়েক বৎসর থাকিয়া আমার বেতনের টাকা সবই আমি ব্যাঙ্কে জমাইয়াছিলাম, কারণ আমার মদ ও পোশাক পরিচ্ছদের টাকা কমলাই দিত। উপরি পাওনাও মন্দ ছিল না। আমি ও কমলা পরস্পরের সম্মতি ক্রমেই ছাড়াছাড়ি হইলাম। অবশ্য কিছু দিন পূর্বেও কমলার সহিত আমার মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ হইত। দূরে আসিলেও তাহার শিকার সংগ্রহে আমি সাহায্য করিতাম এবং মাঝে মাঝে কমিশন স্বরূপ কিছু কিছু লাভও হইত। এই প্রকার ঘৃণিত কার্যেও আমার অরুচি ছিলনা—অসৎসঙ্গের কি ভয়াবহ পরিণাম!

নারী-নৃত্য ও অবাধ মেলামেশা

যে সকল কারণে আমার মত লম্পট পতিতের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যশ্লোক সতী সাবিত্রীর স্বদেশীয়া ও স্বজাতীয়া বলিয়া পরিচিতা মহিলাগণের মধ্যে পাতিত্যের বিষ ছড়াইয়া পড়িতেছে, অবাধ মেলামেশা, ভদ্রমহিলার থিয়েটার ও নৃত্য তাহার মধ্যে প্রধান। এই থিয়েটার ও নৃত্যের সংস্পর্শে আসিয়া এ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহার একটু বর্ণনা বোধ হয় আমার পতিত জীবনের কাহিনির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া অপ্রসাঙ্গিক হইবে না।

বাংলার ভদ্রমহিলার নৃত্য-নাট্যাভিনয়ের প্রবর্তক কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি নিজ পরিবারের মহিলাদের লইয়া সর্বপ্রথম "বাল্মিকী প্রতিভা" অভিনয় করেন। এই নাটকে সরস্বতীর ভূমিকা অভিনয় করিয়া কবিবরের ভ্রাতুষ্পুত্রী—পরে স্বর্গীয আশুতোষ চৌধুরীর স্ত্রী ঁপ্রতিভা দেবী নাকি অজস্র সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ;[১৭] ইহার পরও কবিবর তাঁহার নিজ পরিবারের মহিলাদের লইয়া আরও অনেকগুলি নাটক ও নাটিকার অভিনয় করেন। ওই সকল পারিবারিক নাট্যাভিনয় ও নৃত্যগীত প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য অবশ্য আমার হয় নাই ; কিন্তু শুনিয়াছি প্রকাশ্যে টিকিট বিক্রয় না হইলেও ঠাকুর পরিবারে মহিলা ও পুরুষগণের বন্ধু এবং অনুগৃহীত শত শত ব্যক্তি ওই অভিনয় দর্শন করিয়াছেন।

নিজ পরিবারের মহিলাদের লইয়া নাট্যাভিনয় করিবার বিষময় ফলের কথা ঠাকুর পরিবারেরই পথভ্রষ্টা কন্যা কমলার নিজমুখে শুনিয়াছি, সে পরিষ্কার বলিয়াছে—"আমার চটুল নৃত্যাভিনয় দেখিয়া দর্শকগণ বিশেষ আকৃষ্ট হইত, তাহাই আমার পতনের অন্যতম কারণ—।" জানি না ইহার পরও কি সাহসে অথবা কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার থিয়েটারের পরিসর নিজ পরিবার হইতে শান্তিনিকেতনে "আশ্রমবাসিনী" মহিলাদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমটি বহু লোকের দানে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহা তাঁহার নিজ সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত কিনা জানিনা, কিন্তু আশ্রমবাসিনী বালিকা ও তরুণীদের অভিভাবক এবং অভিভাবিকাগণও কি তাঁহাদের মেয়েদের দ্বারা থিয়েটার করাইবার জন্য কবিবরকে ভার দিয়াছেন ? তবে ইহা ঠিক যে ভদ্রমহিলার সংগীত ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত—নূপুর নিক্বনে মুখরিত—নৃত্য-চপল অঙ্গভঙ্গির ললিত লীলায় লীলায়িত শান্তিনিকেতনে এমন কোন আকর্ষণ আছে—যাহার লোভে কুচবিহারের স্বামীত্যাগিনী রাণি নিরুপমা দেবীও আজ রাজঐশ্বর্য ছাড়িয়া সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে অভিলাষিণী হ’ন।

শান্তিনিকেতনের তরুণীদের লইয়া কবিবর যে নাট্যাভিনয় করিয়াছেন তাহার মধ্যে শারদোৎসব, বর্ষামঙ্গল, নটরাজ, নটীর পূজা, সুন্দর [য], হইতে আরম্ভ করিয়া 'তপতী' পর্যন্ত অনেকগুলি আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি কিন্তু অনেক চেষ্টা ও পরিচয়পত্র দেখাইয়াও 'সবুজঘরে' (গ্রীন রুম) প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি নাই। প্রবেশ করিতে আমি পারি নাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে সেখানে পর্দার বড় ঘনঘটা! মূল রহস্যটি হইতেছে এই যে—ঠাকুর বাড়ি ও শান্তিনিকেতনকে ঘিরিয়া আভিজাত্যের এক ঘন ও দুর্ভেদ্য বেষ্টনী রহিয়াছে। এই আভিজাত্য শিক্ষা দীক্ষার, বংশ মর্যাদার, বা নিছক অর্থসম্পদের নহে—ইহা সুশিক্ষিত, (well-trained) সুসংস্কৃত একটি বিরাট চাল বা ধাপ্পাবাজি মাত্র।

শান্তিনিকেতনের মেয়েদের লইয়া রবীন্দ্রনাথ যে নাট্যাভিনয় করেন তাহাতে নায়কের অংশ গ্রহণ করেন তিন নিজেই। চুল দাড়িতে কলপ মাখিয়া 'কচি' সাজিয়া তিনি কখনো কখনো কিশোরী-কুমারীর সঙ্গে নাট্যাভিনয় করেন।

অভিনয়ে কখনো বা উদ্ভিন্নযৌবনা মহিলাকে অভিনেতার বাহুপাশে আবদ্ধ ও আলিঙ্গন করিতে হয় কিন্তু কুমারী মহিলার সঙ্গে এভাবে অভিনয় করিয়া কোন সূক্ষ্ম রসতত্ত্বের বিশ্লেষণ যে করা হয়, তাহা আমার ন্যায় লম্পটও বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। অবাধ মেলামেশার পূর্ণ স্বার্থকতা বোধ হয় এই সকল অভিনয়। অবাধ মেলামেশা ও অবরোধ প্রথা এক জিনিস নহে। অবরোধ প্রথা তুলিয়া দিলেও অবাধ মেলামেশা না করিলে চলিতে পারে। নারীনৃত্য ও অবাধ মেলামেশার বিষময় ফলের বহু দৃষ্টান্ত আছে কিন্তু একটু পুরাতন না হইলে অর্থাৎ খাতায় নাম না লেখান পর্যন্ত ছাপার অক্ষরে বাহির করা চলে না। পাঠক—ধৈর্যংরহু।

কবিবর যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন—সেই পথে চলিবার মত লোকের অভাব হয় নাই। সংক্রামক ব্যাধির মত এই নারী নৃত্য গোটা দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং অল্প কাল মধ্যেই ইহার বিষময় ফল ফলিতেছে। দেশে স্থায়ী ও অস্থায়ী ভদ্রমহিলার বহু নাট্য-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, তাহারই দুই একটির কথা বলিব। পূর্বেই বলিয়া রাখি কোথাও সামান্য চেষ্টায় এবং কোথাও-বা বহু চেষ্টায় এই সম্প্রদায়গুলির অধিকাংশেরই অন্তরঙ্গ রূপে প্রবেশ করিতে এবং মহলা কালে মহলা গৃহে ও অভিনয় কালে গ্রীনরুমে স্থান লাভ করিতে পারিয়াছি ; সুতরাং এগুলি সম্বন্ধে যাহা বলিব তাহাও আমার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা বলিয়া আখ্যাত করা অসংগত হইবে না।

দেববালা দেবী নাম্নী বেহালার হালদার পরিবারের কন্যা পলাতকা শান্তির (ডাক নাম) উপপতি ও তাহারই দেহতটকে বিবিধ পটে অনুরঞ্জনকারী বাঙাল আর্টিস্ট মহাশয়ের নাম বাংলা দেশে সুপরিচিত। কোন বিশেষ সৎকার্য (?) উপলক্ষে যখন এম্পায়ার থিয়েটারে বৃন্দাবনলীলার অভিনয় করিবার জন্য মহিলা সংগ্রহ করিতে (পাঠকের কাছে বিনীত নিবেদন তাঁহারা যেন বসুমতীর 'রাণী ইউজিনীর বৈঠকের' বিজ্ঞাপনে লিখিত—'অরুচি

ধরা রাজকুমারের পল্লীবাসিনী অনভিজ্ঞা কুমারী ধরার জন্য যাত্রার" সহিত তুলনা না করেন) নৃত্যকুশলা বালিকাদের অভিভাবকদের দ্বারস্থ হইলেন তখন অভিভাবকেরা জানিয়া শুনিয়াও ইহার হস্তে বালিকাদের সমর্পণ করিলেন। অভিনয়ে সংগৃহীত অর্থ কোন্ সৎকার্যে ব্যয় হইয়াছে তাহাও আমরা জানি।

আর এক নাট্য সম্প্রদায় ছিল আমহার্স্ট স্ট্রীটে। একবার লীলাবতী নাম্নী নৃত্যপটিয়সী এক বেশ্যাকে কুমারী লীলা মুখার্জি সাজাইয়া তাঁহাদের দলভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন এবং পরে ধরা পড়িয়া এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে আরও দু-একটি কথা বলিব। সম্প্রদায়ের কর্ণধার বা সেনাপতি মহাশয়ের এক বন্ধু—ফরিদপুর নিবাসী উচ্চ বংশের বিবাহিতা যুবতী শ্রীমতী চামেলীকে কুলের বাহির করিয়া আনিয়া তাঁহার নিকট রাখিয়াছিল, তিনি ওই যুবতীকে পাঠাইয়া বড়বাজারে মাড়োয়ারিদের নিকট বহু টাকার টিকিট বিক্রয় করাইয়াছিলেন। এই মেয়েটি থিয়েটারের অনেক অভিনেতার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে বাধ্য হইয়াছিল। কলিকাতার কোন পাবলিক থিয়েটারের প্রিয়দর্শন তরুণ অভিনেতাকে ইহারা মহলা শিক্ষক রাখিয়াছিলেন। এই শিক্ষক মহাশয় মদ্যপান করিয়া মহলা শিক্ষা দিতে আসিতেন ; কোথাও একটু বেফাঁস কথা হইয়া গেলেও দু'টি মিষ্টি বাক্যে তাহা শোধরাইয়া লইতেন—। অভিভাবকদের কাহারও কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, তাঁহারা তাঁহাদের কন্যাদের ইহার নিকট শিক্ষা গ্রহণে আপত্তি করিবার কোন কারণ নাকি খুঁজিয়া পাইতেন না। তবে এই সকল মেয়েরা স্বভাবতই চতুরা ; অভিনেতাটির পরিহাসে তাঁহারা অস্বস্তি বোধ করে নাই, বাড়াবাড়ি দেখিলে কুটিল ভ্রূভঙ্গীতে একটু শাসাইয়াছে। অভিনেতাটি কাহারও হাত ধরিবার বা চুলের বেণি নাড়িয়া দিবার চেষ্টা করিলে সতর্কতার সহিত সরিয়া গিয়া আবার তাঁহার সহিত হাসিয়া কথা কহিয়াছে। একটা ঘটনা আমার বিশেষ মনে আছে ; একটি স্থূলকায়া যুবতী রামায়ণের ঘটনা সম্বলিত কোন নাটকে পুরুষের ভূমিকা গ্রহণ করিত, তখন তাহার বয়স আন্দাজ ষোল সতর, গৌর বর্ণ না হইলেও তাহাকে সুন্দরী বলা যায়। এই যুবতীটিকে পাশের ঘরে লইয়া নির্জনে বসিয়া তাহার একটি গান শুনিবার জন্য কত চেষ্টাই না তিনি করিয়াছিলেন। মেয়েটি কিন্তু নীচে উপরে ছুটাছুটি করিয়া বেচারিকে নাস্তানাবুদ করিয়া তবে ছাড়িয়াছিল—অবশ্য হাস্য ও অপাঙ্গদৃষ্টিতে কথঞ্চিৎ ক্ষতি পূরণ করিতে ছাড়ে নাই।

ভদ্রমহিলার থিয়েটার সম্পর্কে এক মিসেস সরকারের কথা না বলিলে নয়। ইনি যে কবে মিসেস হইয়াছিলেন জানি না, তবে যুক্ত প্রদেশের [বর্তমান উত্তর প্রদেশ] কোন ক্ষুদে নেটিভ প্রিন্সের জনৈক রক্ষিতা নারীর সহিত তাঁহার পূর্বজীবনের সম্পর্ক থাকা নাকি বিচিত্র নয়। ব্যারিস্টার-প্রিয়া এই মিসেসটির হৃদয়ে হঠাৎ ভদ্রঘরের মহিলাদের লইয়া নাচিবার শখ হইল—একদল বালিকাও জুটিয়া গেল। এম্পায়ার থিয়েটারে রাসলীলা শুরু হইল এবং লীলাবসানে রাসেশ্বরী শ্রীমতী কোন তরুণ বজ্রকিশোরকে কর্ণধার করিয়া অচেনা দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন।

আর অয়ান ঘোষ? বেচারি অনেক হা হতোহস্মি করিয়া অবশেষে চটিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন—"মিসেস্...অমুকের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।" বাংলা দৈনিকের পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন।

নারী নৃত্যের আর একটি আস্তানা এল্‌গিন রোডে। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের পৌত্র কুনাল সেন, কুণাল সেনের স্ত্রী, নৃত্যফিল্ম বিশারদ মধু বোস[১৮], রেবা রায় প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন স্বর্গ হইতে নাতি নাত্‌ বৌ'র নৃত্য দেখিয়া বোধ হয় আনন্দে ডুগডুগি বাজাইতেছেন। কুনাল যে কুণালে যায় নাই এজন্য তাঁহার বোধ হয় আনন্দের আর সীমা নাই। এই সম্প্রদায় স্ত্রী পুরুষে 'আলিবাবা' 'আবু হোসেন' প্রভৃতি নাটক অভিনয় করিয়াছেন। এক বিশিষ্ট অভিনেতা আলিবাবা নাটকে 'আবদালা' সাজিয়া 'মর্জিনা' রূপী নিজের ভাগিনেয়ীর সঙ্গে 'বাদশা-বেগমের' অভিনয় করিয়া দর্শকবৃন্দকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন।

এমন নৃত্য-গীত-বহুল নাটক অধুনা বিরল—আব্‌দালা ও মর্জিনার নৃত্য ও গীতের একটু নমুনা এখানে দেওয়া হইল।

গান ও নাচ

আব্‌দালা—আমি বাদ্‌শা বনেছি।
মর্জিনা—আমি বেগ্‌ম সেজেছি।
(উভয়ের হাত ধরাধরি করিয়া)
বাদ্‌শা বেগম ঝম্‌ ঝমাঝম্‌ চলছি মোরা—ইত্যাদি।

ভাগিনেয়ীকে বেগম সাজাইয়া [হাত] ধরাধরি করিয়া নাচিতে গাহিতে যে কি স্বর্গীয় আনন্দ তাহা সাধারণ লোক বুঝিতে পারে না বলিয়া নিন্দা করিয়া মরে। কবি রবীন্দ্রনাথও নিজে রাজার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূকে রানি সাজাইয়া অভিনয় করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, অন্য সকলে তাহাই অনুসরণ করিতেছে মাত্র।

সংগীত সম্মিলনীর মেয়েরাও প্রকাশ্যে নৃত্যাভিনয় করেন। তাঁহাদের সংগীত, নৃত্য ও অভিনয় একটু উচ্চতর শ্রেণির ; এজন্য তাহার পরিণামও উচ্চতর। বাংলার গীত-মৃণালে যুগল পদ্ম দিলীপকুমার রায়[১৯] ও কুমারী সাহানা দেবী[২০] এই সংগীত সম্মিলনীর ছাত্র ছাত্রী—বর্তমানে তাঁহারা অরবিন্দাশ্রমে গিয়া আধ্যাত্মিকতার গূঢ় সাধনায় মগ্ন হইয়াছেন।

ভদ্রমহিলার নৃত্যাভিনয়কে যিনি জাতে তুলিয়াছেন, সেই কুমার গোপীকারমণের কথা এবার বলিব।

কুমার বাহাদুরের কলানুরাগ সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে সে তাঁহার শ্রীহট্টের বাড়ির চারিদিকে কদলী বৃক্ষে পরিপূর্ণ। শ্রীহট্টে যাই নাই, সে সকল কদলী বৃক্ষও দেখি

নাই, তবে বালিগঞ্জে তাঁহার শ্বশুর গৃহে এবং ১৮নং গড়িয়াহাট রোডে তাঁহার ভাড়াটে বাড়িতে কলানুরাগের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি বৃক্ষ আছে দেখিয়াছি। এই গোপীকারমণের নাট্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় প্রথম যৌবনে—স্টারে। দুর্ভাগ্যবশত প্রথম জীবনে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল না।

দেড় বৎসর পূর্বে কুমার গোপীকারমণ কলিকাতার বাজারে নিজেকে নাট্য-রসিক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং প্রথমে রাধিকানন্দ সম্প্রদায়ের সঙ্গে পাণ্ডব গৌরব, পরে স্বতন্ত্রভাবে আলমগীর নাটক অভিনয় করেন। আলমগীর নাটকে স্ত্রীভূমিকায় এবং নর্তকী সঙ্ঘে কলিকাতার কয়েকজন পেশাদারী বেশ্যা অভিনেত্রী যোগদান করিয়াছিল। বেশ্যা পরিপূর্ণ গ্রীনরুমে কুমারী কন্যা গৌরীর প্রবেশ সমর্থন করিয়া এবং সাকীবেশীনী অভিনেতৃর সংগীকালে উইংসের পাশে বসিয়া ওই কন্যা দ্বারা হারমোনিয়াম বাজাইয়া যে সাহসের পরিচয় তিনি দিয়াছেন তাহা তৎকালীন সাময়িকপত্রাদিতে প্রসংশিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারী[২১] ও আধুনিক যুগের অভিনেত্রীগণের অগ্রগণ্যা শ্রীমতী নীহারবালার[২২] কথা প্রসঙ্গে কুমার বাহাদুর, তাঁহার কনিষ্ঠা রানি সুরুচিবালা ও কুমারীগণের সুমিষ্ট আলাপ ও সদয় ব্যবহারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এমন কি নীহারবালা একথাও বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের অভিনয় দেখিয়া মনে হইল যে, তাঁহারা যদি আমাদের মত দীর্ঘকাল অভিনয় করেন তবে য়ুরোপ আমেরিকার অভিনেত্রীদের ন্যায় প্রভূত যশ ও অর্থ উপার্জন করিতে পারিবেন।

কথাটা ঠিক ; উদিপুরী বেগমরূপে সুরচিবালাকে এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে প্রথম যখন দেখিয়াছিলাম, আমার মনের তখনকার সেই ছাপ এখনও দূর হয় নাই। উদিপুরী বেগমকে আমি অনেক দিন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিয়াছি। অভিনয় ও নৃত্যের যথার্থ স্বার্থকতা সেইখানে, যেখানে উহা শ্রোতা ও দর্শকের মনে ছাপ রাখিয়া দিতে পারে। অভিনয়ের স্বার্থকতার ছাপ, ছাপ পাপ ও পুণ্য উভয় প্রকারই হয়। আমার ন্যায় ঝুনা লম্পট নাটকে পাপের ছাপযুক্ত না হইলেও যুবকগণের কি দশা ঘটে কে জানে! রানি সুরুচিবালাকে পর পর উদিপুরী, কুবেণী, মরিয়াম, আকবর মহিষী প্রভৃতি ভূমিকায় এবং কুমারী গৌরীকে নৃত্যগীতাভিনয়ে নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে দেখিয়াছি। গানে আমার বিশেষ অনুরাগ থাকিলেও অভিনয়কলার প্রতি অনুরাগের লেশ মাত্র আছে এমন অপবাদ পরম শত্রুও দিবে না—রানি, কুমারী ও অন্যান্য মহিলাদের লীলায়িত অঙ্গ-ভঙ্গিই আমাকে তাঁহাদের অভিনয়ের অনুরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

মনে পড়ে গড়িয়াহাট রোডের বাড়িতে এক দিন দিবাভাগে সিংহল বিজয় নাটকের অভিনয় হইতেছিল। কুমারী গৌরী সুললিত নৃত্যে সমবেত দর্শমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিতেছিলেন। নৃত্যের আবেশে কুমারী তন্ময়—উন্মত্তবৎ দর্শকমণ্ডলী ঘন ঘন করতালি ও জয়োল্লাসে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছিলেন। এমন সুঠাম অঙ্গ-ভঙ্গিযুক্ত নৃত্য আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। কুমার বাহাদুরের চেষ্টা ও অর্থ সাহায্যে এই প্রকার নারীনৃত্যের দল ক্রমে বর্ধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শুনা যায়, কুমার বাহাদুর কলিকাতাব অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন মানসে সপরিবারে থিয়েটার করিয়া তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন কিন্তু ওই সকল অভিজাতবর্গ কুমার বাহাদুরেব স্ত্রীর অভিনয় সম্ভোগ জন্য দলে দলে সমাগত হইলেও তাঁহার পরিজনবর্গের সহিত ঘনিষ্ঠতার কোন নিদর্শন তাঁহারা দেখান নাই। কৃতঘ্নতা আর কাহাকে বলে!

কলিকাতার মনোমোহন থিয়েটার "গোপীকারমণ শ্রীকৃষ্ণ" নামক একটি সারগর্ভ অভিনয় করায়, কুমার বাহাদুর ওই নাটক তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়া লেখা হইয়াছে, এই অভিযোগে থিয়েটার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আড়াই লক্ষ টাকার দাবীতে এক মানহানির মামলা দায়ের করিয়াছিলেন। বেশ্যাদের সঙ্গে যাহারা সপরিবারে থিয়েটার করিতে পারে এবং নিজের স্ত্রী কন্যাকে যাহারা সহস্র সহস্র লোকের লালসা উদ্দীপক নৃত্যগীতে প্রমত্ত হইতে দিতে পারে তাহাদের মানের মূল্য জানি না। হাইকোর্টে এই মূল্য নির্ণীত হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে বেশ্যার সঙ্গে অভিনয়ে মূল্য বাড়ে কি কমে!

শ্রীহট্টবাসী সম্বন্ধে এই বচনটি প্রচলিত আছে—

ভাইরে—কিবা দেশের কিবা গুণ,
একই গাছে পানসুপারি একই গাছে চুণ!

কোন শ্রীহট্টবাসী অশত্থ গাছের পাতাকে পান, লাল ফলগুলিকে সুপারি এবং গাছে শকুনের সাদা বিষ্ঠাকে চুন মনে করিয়া আশ্চর্য হইয়া ইহা বলিয়াছিল। কুমার বাহাদুরের অবস্থা দেখিয়াও আমাদের বার বার এই বচনটাই মনে হয়েছে। বাংলার আর কোন্ রাজকুমার বা বিশিষ্ট ভদ্র সন্তান স্ত্রী কন্যা লইয়া বেশ্যা ও পরপুরুষের সঙ্গে থিয়েটার করিয়াছে? কুমার বাহাদুর শ্রীহট্টবাসী তথা বাংলার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন—কুমার বাহাদুরের জয় হোক। "গোপীকারমণ শ্রীকৃষ্ণ" অভিনয় তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়াই অভিনীত হইয়াছে বলিয়া তিনি যখন মনে করেন তখন আমরা বলিতে বাধ্য যে এমন ঘৃণিত চিত্রেই তিনি চিত্রিত হইয়াছেন যে এই কলঙ্ক কালিমা দূর করিতে দুই এক শতাব্দী চলিয়া যাইতে এ।

হাট রোডের অভিনয়ে পূর্বোক্ত দেববালাকে ভদ্রমহিলার আসনে দেখা গিয়াছিল। এই দেববালাদিগের কথা এখানেই কিছু বলিব। দেববালা, সুনীলা ও অনিলা তিন বোন, বেহালার প্রসিদ্ধ হালদার বংশের কন্যা। মাতা ও এক ভ্রাতা ইহাদের সঙ্গে আছেন। দেববালার বিবাহ হয় পুলিশের এক সব-ইনস্পেক্টারের সঙ্গে। সব-ইনস্পেক্টারটি তাঁহার স্ত্রীকে বন্ধুমহলে পরিচয় করাইয়া দেন, পরিচয় ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়, তৎপর উধাও। ইহার দুইটি ছোট মেয়ে ছিল, তাহাদিগকে ফেলিয়াই চলিয়া আসে। বাজারে আসিয়া তাহার একটি ছেলে হইয়াছে। ছেলের নাম দেবকুমার মজুমদার, বয়স ৭—৮ বৎসর ; এ নামে স্বার্থকতা আছে বটে। সুনীলা বিধবা, বয়স ২০।২১, বেশ্যালয়ে একটি মেয়ে

হইয়াছে। এ মেয়ের নাম 'ঋষিকুমারী' রাখা উচিত—কলিকাতা হাইকোর্টের এক ঋষি-ব্যারিস্টারের ঔরষে ইহার জন্ম। মাতা কনিষ্ঠা কুমারী কন্যা অনিলাকে লইয়া ইহাদের সঙ্গে বাস করিতেছেন। একটি ভাইও সঙ্গে আছে। ইহাদের অপর দুই ভাই স্থানান্তরে চাকরি করেন। ইচ্ছা থাকিলে কনিষ্ঠা কন্যার পুত্রকে লইয়া মাতা সৎভাবে জীবন যাপন করিতে পারিতেন। অনিলাও পতিতা বৃত্তি অবিলম্বন করিয়াছে। ভদ্রবংশের কি শোচনীয় পরিণাম! এই তিনটি বোনই অবাধ মেলামেশার ফলে আজ পতিতা বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

পদ্মরঞ্জন

পূর্ব অধ্যায়ে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, পদ্মরঞ্জন সরকারের সহিত আমার পরিচয়ের বিশেষ বিবরণ পাঠকগণকে উপহার দিব। তাঁহার কথা একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, কমলার কথা লিখিতে লিখিতে উহার কথা আবার মনে হইল, তাই পাঠকগণকে সেই অদ্ভুত কর্মী বাঙালির চরিত কথা শুনাইবার প্রেরণা আমার জাগিয়া উঠিয়াছে এবং মনে হইতেছে, আমার জীবন কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত, যদি এই কাহিনি ইহার অন্তর্ভুক্ত না করিতাম।

পদ্মরঞ্জন সার্থক নাম ; পদ্মকে যিনি রঞ্জন করেন তিনিই পদ্মরঞ্জন ; এই অর্থে পদ্মরঞ্জন বলিতে সূর্য অথবা ভ্রমরকে বুঝায়। যে অর্থই লওয়া যায় সেই অর্থেই পদ্মরঞ্জন সার্থক নাম তাহাতে সন্দেহ নাই। ভ্রমর যেমন নানা ফুলের মধু লুটিয়া বেড়ায়, আমাদের পদ্মরঞ্জনও তেমনি কত প্রেমমধু লুটিয়া লইয়াছেন তাহার সংখ্যা করা দুরূহ। ভ্রমরের বর্ণের সঙ্গে তাঁহার বর্ণের সাদৃশ্য না থাকিলেও ভ্রমরের হুলের মত তাঁহার হুলেও বিষ আছে, তাঁহার স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত করিলে সেই বিষাক্ত হুলে তিনি লোককে দংশন করিতেও ছাড়েন না, এমন কি জীবনান্ত করিতে পারেন। অপর দিকে সূর্যের ন্যায় তিনি সর্বজন পরিচিত, সূর্যের কিরণের ন্যায় তাঁহার যশোকিরণে (?) বাংলাদেশ উদ্ভাসিত। সূর্যের চতুর্দিকে যেমন নানা গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিয়া বেড়ায় পদ্মরঞ্জনের চতুর্দিকেও তেমনি তাঁহার দলের কত গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। সূর্যের তেজে অবিরত মস্তিষ্কের পীড়া হয়, সর্দি গর্মি হয়, তাহা যেমন লোকে বলে না—সূর্যকে জগতজীবন বলিয়াই লোকে স্তুতি করিয়া থাকে, পদ্মরঞ্জনের দুশ্চরিত্রতার কথাও তেমনি লোকে বলে না ; দেশহিতৈষী উপনেতা বলিয়াই লোকে তাহাকে প্রশংসা করিয়া থাকে। পদ্মরঞ্জন ভাগ্যবান তাহাতে সন্দেহ নাই। চরিত্র হিসাবে পদ্মরঞ্জন আর রমেশচন্দ্র বস্তুবিশেষের এপিঠ আর ওপিঠ ; কিন্তু পদ্মরঞ্জন আজ দল বিশেষের ও অপরিচিতের নিকট পূজ্য (?) আর রমেশচন্দ্র আজ লোকচক্ষে ঘৃণিত লাঞ্ছিত। অদৃষ্টের কি পরিহাস!

পদ্মরঞ্জনের সহিত আমার প্রথম পরিচয় স্বদেশি যুগে। আমরা যখন স্বদেশি ভলাণ্টিয়ার হইয়া খুব হৈ চৈ করিতেছি। একদিন একজন দেশপূজ্য নেতা আমাকে ডাকিয়া চিৎপুরের একটি ঠিকানা দিয়া বলিলেন—"রমেশ তুমি এই ঠিকানায় একবার যাবে। একটি ছেলে নাম পদ্মরঞ্জন সরকার, সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। ছেলেটি একজন ভলাণ্টিয়ার। কিছু সাহায্য চেয়েছে, তাকে দেখে আসবে এবং পঁচিশটি টাকা দিয়ে আসবে।" আমাকে টাকা দেওয়ার পর আমি সে কথা অন্যান্য কাজের ভিড়ে ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। দুই তিন দিন পর অন্য একটি কার্য শেষ করিয়া জোঁড়াসাঁকো হইতে চিৎপুর দিয়া ট্রামে ফিরিতেছি এমন সময় হঠাৎ কথাটা মনে পড়িল, তখন রাত্রি প্রায় দশটা। মনে খুব অনুশোচনা হইল, অসুস্থ অবস্থায় বেচারা সাহায্য চাহিয়াছে, আর সেই টাকা তিনদিন হইল আমার পকেটে

পকেটেই ঘুরিতেছে! রাত্রি বেশি হইলেও আজই তাহাকে টাকা দিতে হইবে, এই সংকল্প করিয়া আমি ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িলাম এবং অনুসন্ধান করিয়া সেই ঠিকানায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, একখানা খোলার ঘর, দরজা ভেজান ছিল, ঠেলিতেই খুলিয়া গেল, আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ঘরের কোণে একখানি তক্তপোশের উপর একটি রমণী পাশাপাশি বসিয়াছিলেন। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে স্ত্রীলোকটি পুরুষের পার্শ্ব হইতে সরিয়া গেলেন। স্ত্রীলোকটি যুবতী, সুন্দরী, তাহার শূন্য হস্ত ও পরিধানে থান কাপড় দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে তিনি বিধবা। পুরুষটি রাগের বশে আমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে মশাই আপনি? বলা নেই কওয়া নাই একেবারে ঘরের ভিতর এসে পড়েছেন।" আমি নিজেও একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিলাম কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—" আপনারই নাম কি পদ্মবাবু"? তিনি সেই প্রকার ক্রুদ্ধস্বরেই উত্তর করিলেন—"হ্যাঁ কেন?"

আমি তাঁহাকে বলিলাম যে অমুক বাবুর নিকট তিনি অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করায় এবং প্রায় মৃত্যুশয্যায় পতিত হইয়াছেন, এই কথা লেখায় তিনি আমাকে আপনার অবস্থা দেখিতে এবং প্রয়োজন হইলে কিছু সাহায্য করিতে পাঠাইয়াছেন। তাহার পর একটু ব্যঙ্গের সুরে বলিলাম—"কিন্তু মশাই তো দেখছি বেশ সুস্থ শরীরে, বেশ মজাতেই আছেন। চিঠিখানা বোধ হয় আপনার নাম জাল করে কেউ লিখে থাকবে। আমি যাই, সেই কথাই তাঁকে বলিগে।" আমার এই কথা শুনিয়াই পদ্মবাবুর মেজাজ একেবারে বদলাইয়া গেল। কথার সুরও তারা পরদা হইতে একেবারে উদারায় নামিয়া আসিল। তিনি আমাকে যত্ন করিয়া বসাইয়া আত্মদোষ স্খালনের জন্য অনেক আবোল তাবোল বকিতে আরম্ভ করিলেন। আমি মনে মনে হাসিলাম, কিন্তু মুখে কিছু বলিলাম না। প্রায় ঘণ্টাখানেক বসিয়া গল্প করিয়া তাঁহাকে পনেরটি টাকা দিয়া আসিলাম।

পঁচিশ টাকার মধ্যে পনেরটি টাকা দেওয়ার কারণ ইহাই ছিল যে অবশিষ্ট দশটি টাকা দেওয়ার উপলক্ষ্য করিয়া আর একদিন আমি সেই বাসায় যাইব। আমার মনে পাপ-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল। ইনি যে আমার বাসনা সিদ্ধির অনুকূল হইবেন তাহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

হইলও তাহাই। আর একদিন ওই দশটাকা লইয়া আমি সেই বাসায় গেলাম। তার পর আরও দুই চারি দিন গেলাম। নিজ হইতে কয়েকটি টাকাও দিলাম। তাহার ছেলের জন্য খেলনা জামা ইত্যাদি লইয়া দুই একদিন গেলাম। এই ভাবে কিছুদিন যাতায়াতের পর তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইল। বিধবাটি পদ্মবাবুর উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না। অনেক আশা ভরসা বাবু তাহাকে দিয়াছিলেন কিন্তু তাহাকে যে প্রকার দুরবস্থায় তিনি রাখিয়াছিলেন তাহাতে তাহার মেজাজ বিগড়াইয়া গিয়াছিল। তাহার নিকট বাবুর পূর্ব জীবনের অনেক কথাই আমি জানিতে পারিয়াছিলাম।

ময়মনসিংহ জেলার (কোন মহকুমার এখন স্মরণ নাই, সম্ভবত কিশোরগঞ্জ হইবে।)*

---

* কিশোরগঞ্জ নয়—সজিউরার একটি গ্রামে।

একটি গ্রামে পদ্মরঞ্জনের জন্ম হয়। তাঁহার প্রকৃত এবং প্রাথমিক নাম ছিল রোহিণী সরকার। ময়মনসিংহের কোন মহকুমার এণ্ট্রান্স স্কুলে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন, কিন্তু কোন গুরুতর অপরাধের জন্য স্কুল হতে বহিষ্কৃত (Rusticated) হন। তাহার পর ময়মনসিংহ আসিয়া তিনি স্কুলে ভর্তি হন। যে প্রতিভার বলে লম্পট এবং সর্বপ্রকার প্রতারণায় সিদ্ধহস্ত পদ্মরঞ্জন আজ একজন উপনেতা বলিয়া পূজা (?) পাইতেছেন, সেই অপূর্ব প্রতিভার প্রথম উন্মেষ এই সময়েই দেখা গিয়াছিল। অন্য হইলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত কিন্তু ইনি তেমন পাত্রই ছিলেন না। রোহিণীকান্ত বেমালুম পদ্মরঞ্জনে পরিণত হইয়া ময়মনসিংহ স্কুলে ভর্তি হইয়া গেলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ময়মনসিংহে থাকাও তাঁহার বেশি দিন ঘটিল না। দরিদ্র পদ্মরঞ্জন অন্যের অনুগ্রহে এক বাসায় থাকিয়া স্কুলে পড়িতেন। সেই বাসার কর্তৃপক্ষ পদ্মরঞ্জনের চরিত্র সম্বন্ধে কতকগুলি কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বাসায় স্থান দিতে অস্বীকৃত হইলেন। স্কুলের কতকগুলি ব্যাপারে জাল জুয়াজুরি ধরা পড়ায়, স্কুল কর্তৃপক্ষও তাঁহাকে মানে মানে বিদায় লইতে আদেশ দিলেন। পদ্মরঞ্জনের ময়মনসিংহের পাঠ সাঙ্গ হইল। তাহার পর তিনি পড়িতে আসিলেন টাঙ্গাইলে। টাঙ্গাইল স্কুলের ডন-মাস্টারের বাসায় তিনি থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন কিন্তু—'আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পস্যতি সঃ পণ্ডিত' [য]—এই নীতির অনুসরণ করিয়া পদ্মরঞ্জন উক্ত শিক্ষকের দোকান হইত না বলিয়া কিছু অর্থ গ্রহণ করায় এবং উক্ত শিক্ষক মূর্খতাবশত তাঁহার এই উদার বিশ্বপ্রেমের মূল্য বুঝিতে না পারায় চোর অপবাদ লইয়া তাঁহাকে তথা হইতেও তাড়িত হইতে হয়। কর্মজীবনের প্রারম্ভে পরের অর্থ আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে তাঁহার একবার 'শ্রীঘর' বাস হয় কিন্তু তিনি আপীলে নাকি খালাস পাইয়াছিলেন শুনিয়াছি।

স্বদেশি আন্দোলনের সময় মিটিং-এর টুল-টেবিল টানাটানি করিয়া, তৎকালীন নেতাগণের অভ্যর্থনার জন্য অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রার নিশান হস্তে কাপ্তেনি করিয়া, "বন্দে মাতরম্" চিৎকারে গলার স্বর ভঙ্গ করিয়া এবং অন্যান্য অনেক প্রকারে নিজেকে জাহির করিয়া পদ্মবাবু একজন নামজাদা স্বদেশিওয়ালারূপে লোকচক্ষুতে পরিণত হন। ক্ষুদ্র মফসস্‌লের গণ্ডিতে তাঁহার মত প্রতিভার যথোপযুক্ত বিকাশ হইতেছে না বুঝিতে পারিয়া, তিনি তখন মহানগরীর দিকে ধাবিত হইলেন। বাল্যকাল হইতেই অন্যের অভাব মোচনের জন্য আত্মত্যাগী পদ্মরঞ্জন কেবলমাত্র পরের দুঃখকাতরতার অনুরোধে এই বাল্যবিধবার অভাব মোচন করিয়াছিলেন। কিন্তু অভাব মোচন করিতে করিতে এমন অবস্থা উপস্থিত হইল যে বিধবাটির পুত্রের অভাবও মোচন হইবার উপক্রম হইল। পদ্মরঞ্জনের দুরদৃষ্ট, তাঁহার অপূর্ব পরোপকারবৃত্তির মর্ম কেহ বুঝিল না।

এই সকল কথা ক্রমে আমি ওই বিধবাটির নিকট জানিতে পারিয়াছিলাম। পদ্মরঞ্জনের সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। বিধবাটির সহিত আমার ঘনিষ্ঠতাও পদ্মরঞ্জন অবগত হইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার বিশেষ কোন ক্ষোভের কারণও হয় নাই। বোধ হয় আমার দ্বারা তাঁহার বিশেষ আর্থিক সাহায্য তৎকালে হইত বলিয়া।

ইহার পর কিছুদিন পদ্মবাবুর কোন সংবাদ রাখিতাম না। আমার কলেজ জীবনে এবং

তৎপর বৈষয়িক জীবনে পদ্মবাবুর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হয়। কলেজ জীবনের ইতিহাস বাগানবাড়ির ব্যাপারে পাঠকগণ যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু সত্যের অনুরোধে আমি বলিতে বাধ্য যে পদ্মরঞ্জন শেষ দিকে মদ্যপান ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং এখনও নাকি তিনি মদ্যপান করেন না। ময়মনসিংহ জেলার কোন সহৃদয় জমিদারের সুপারিশে প্রথমত কুড়ি টাকা কি পঁচিশ টাকা বেতনে তিনি একটি কোম্পানির কেরানি হইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করেন। [১৯১১ সালে হিন্দুস্থান কো অপ ইন্সিওরেন্সে নামমাত্র বেতনে ঢুকেছিলেন] ১৯২৩ সাল পর্যন্ত তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইয়া মাসিক ৪০০ শত টাকায় পরিণত হয়।

কিন্তু বেতন ওই প্রকার হইলে কি হইবে! পদ্মবাবুর অর্থ ভূতে যোগাইত? সাধে কি আমি পদ্মবাবুর এত পক্ষপাতী? এমন অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন লোক আর দুটি ত আমি বঙ্গদেশে দেখিলাম না! পদ্মবাবু ওই তো বেতন পাইতেন কিন্তু তাঁহার ব্যয় কী প্রকার ছিল তাহা একবার শুনিবেন কি?

নবতারা, আসমান তারা, বিমলা, সুশীলা, মাখনবালা, রামবাগানের রানি, পিরালি মোনা, উমাদাস লেনের শ্রীমতী আরছেলা (উড়েনি) প্রভৃতি যে কোন বেশ্যাকে তিনি যখন রক্ষিতাস্বরূপে রাখিয়াছেন তখনই তাহাকে মাসিক এক শত হইতে তিন শত টাকা বৃত্তি স্বরূপে দিয়াছেন। অবশ্য প্রথম জীবনে উড়েনিকে মাত্র ২০্ টাকা নাকি তিনি দিতেন। তিনি চিরদিন এক একটি মেয়েমানুষকে মাসিক মাসহারা দিয়া রাখিতেন। তাঁহার রাজনৈতিক দলের বন্ধুবান্ধব এবং আমার ন্যায় বাহিরের বন্ধুবান্ধব লইয়া সেই সব বেশ্যার গৃহে মাঝে মাঝে উৎসবে মদ্য মাংস এবং অন্যান্য উপকরণের জন্যও জলের মত অর্থ ব্যয় করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। ইহাতেও ২।৩ শত টাকা মাসিক তাঁহার ব্যয় হইত। পদ্মরঞ্জন তাঁহার দলের এবং তৎসঙ্গে নিজের স্বার্থের জন ইলেক্সন ব্যাপারে একবার প্রায় পঞ্চাশ হাজার, একবার বিশ হাজার, একবার প্রায় এক হাজার [টাকা] ব্যয় করেন ; তাহা বাংলা দেশের শিক্ষিত লোক কে না জানে? ময়মনসিংহে তিনি একখানা বাড়ি করিয়াছেন। তাঁহার মহকুমায় একখানা এবং নিজের দেশেও একখানা বাড়ি করিয়াছেন, তাহার ব্যয় যথাক্রমে প্রায় ত্রিশ হাজার, পনের হাজার এবং দশ হাজার। এতদ্ব্যতীত মোটা টাকা তিনি সুদেও খাটাইতেছেন, তাহার পরিমাণও নেহাৎ কম নয়। তাঁহার কলিকাতার বাসা খরচ নাকি মাসিক পাঁচশত টাকার ন্যূন নহে। কলিকাতাতেও তিনি বহু ব্যয়ে নূতন বাড়ি করিয়াছেন শুনিয়াছি। তাহার ব্যয় ৩০।৪০ হাজার টাকা হইবে। প্রায় পাঁচ হাজার টাকা দিয়া মটর কিনিয়াছেন।

পাঠকগণ হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না ; তাঁহাদের মনে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে "কুড়ি টাকা বেতনের কেরানি হইতে যে ব্যক্তি দশ বার বৎসর ৪০০্ টাকা বেতনে উন্নিত হয়, তাহার পক্ষে এই সময়ে এত টাকা ব্যয় করা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে! তিনি বর্তমান সময় উক্ত কোম্পানির এক প্রকার সর্বেসর্বা হইয়া যে বেতন পাইতেছেন প্রথম চাকরিতে প্রবেশ করার দিন হইতে যদি তিনি সেই বেতন পাইতেন তাহা

হইলেও তো এত ব্যয় সঙ্কুলান হইত না।

এ প্রশ্ন সংগত সন্দেহ নাই। আমার বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে এই প্রশ্ন লইয়া আলোচনাও হইয়াছে। আমার একটি দুর্মুখ বন্ধু এই প্রকার আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন বলিয়াছেন—ভূপেন বাড়ুজ্জ্যের এত বিলাসিতার টাকা কোথা হইতে আসে, বি. কে. লাহিড়ীর বাবুগিরির টাকা কোথা হইতে জোটে, এই প্রশ্নও কিছুদিন আগে অনেকে করিত—কেহই উত্তর দিতে পারিত না—অল্পদিন হইল উত্তর পাওয়া গিয়াছে। তোমাদের পদ্মরঞ্জন সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরও অদূর ভবিষ্যতে ওই প্রকার ভাবে তোমরা পাইতে পার, তাহাতে বিচিত্র কি!"

যাহারা নিজে অর্থ ও যশ উপার্জন করিতে অক্ষম তাহারা অপরকে এইভাবে আক্রমণ করিয়াও বোধ হয় একটু শান্তি পায়। বলাবাহুল্য আমার বন্ধুর এই ইঙ্গিতে আমি কখনও বিশ্বাস করি নাই। আমি জানি পদ্মরঞ্জন—পদ্মরঞ্জন। নিধুবাবুর টপ্পা একটু পরিবর্তন করিয়া বলা যাইতে পারে—

—"তাহারই তুলনা সে—এ মহীমণ্ডলে"। তাঁহার অর্থাগমের উপায়ের কথা সাধারণ লোক কি করিয়া বুঝিবে!

তিনি কিছু কমিশনও পাইয়া থাকেন এবং অর্ডার সাপ্লাইয়ের যে খুব বড় কারবার আছে তাহা ইহারা জানিত না। আমি বলিলাম—অর্ডার সাপ্লাই কারবার হইতে ইনি যথেষ্ট টাকা পাইয়া থাকেন। ইহার উত্তরে তাঁহারা বলিলেন—ওইত চালাকি—উহা ত নামকাওয়াস্তে—নইলে যে উত্তর দিবার কিছু থাকে না।

পদ্মরঞ্জন কতবড় অদ্ভুত কর্মী, তাহার কিছু পরিচয় পাঠকগণকে দিতেছি। যখন কোন একটি বিশিষ্টপদের ধ্বংস করিবার জন্য তাঁহাদের দলের অধিনায়ক সংকল্প করিলেন, তখন সেই দলে তৎকালীন যিনি দলের সকলকে সম্মিলিত করিবার জন্য আহ্বান পত্র প্রেরকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সকলকে একমত করিবার চেষ্টা করিবার ভার যাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল (তাঁহার নাম আমরা বসন্ত সরকার বলিয়া উল্লেখ করিব) তিনি চেষ্টা করিয়া অকৃকার্য হইলেন। হতাশভাবে তাঁহাদের অধিনায়ককে আসিয়া জানাইলেন যে দলের বহু সংখ্যক ব্যক্তি তবেই অধিনায়ককে সাহায্য করিতে স্বীকৃত আছেন যদি তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ইপ্সীত রমণী লাভের সুযোগ দেওয়া যায়। বসন্ত সরকার বলিলেন যে তাঁহার দ্বারা এই ঘৃণিত কার্য হইবে না, সুতরাং তিনি তাঁহার পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। দলের অধিনায়ক কথাটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া, বসন্তবাবুকে কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে বলিলেন ; তখন বুঝিতে পারা গেল যে দলের বাবুদের অনেকে নিজের পয়সা খরচ করিবেন না, বিনা পয়সায় আমোদ করিতে চান, কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেককেই আমোদের জন্য নির্দিষ্ট স্ত্রীলোক আনিয়া দিতে হইবে। কেহ চাহিয়াছেন মেম, কেহ চাহিয়াছেন ইহুদী, কেহ চাহিয়াছেন পার্শি স্ত্রীলোক, কেহ কেহ বাঙালিতেই সন্তুষ্ট আছেন কিন্তু নাম করিয়া বলিয়া দিয়াছেন অমুক অমুককে চাই। দলের মধ্যে একজন ছিলেন যাঁহার প্রতিপত্তি অন্য অপেক্ষা বেশি ছিল, তিনি হুকুম করিয়াছেন যে তাঁহার একটিতে পোষাবে না। বাঙালি, ইহুদি, মেম, পার্শি সর্ব জাতীয় স্ত্রীলোক তাঁহাকে জোটাইয়া

দিতে হইবে। অধিনায়কতো মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। অথচ তখন এই সব লোককে হাত করিতে না পারিলে তাঁহার সম্মান প্রতিপত্তি সবই নষ্ট হয়। আমাদের পদ্মরঞ্জন এই কথাবার্তার সময় উপস্থিত ছিলেন, তিনি উঠিয়া টেবিলে এক চাপড় মারিয়া বলিলেন—"কুছ পরোয়া নেই—ওরা যা চাচ্ছে আমি তাই দেবো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমি ভার নিচ্ছি"—বলা বাহুল্য, পদ্মরঞ্জন এই অসাধ্য সাধন করিতে পারিয়াছিলেন এবং অধিনায়কের সম্মান প্রতিপত্তি তাঁহার দ্বারাই সেবার রক্ষিত হইয়াছিল। গোবেচারা বসন্ত বাবুর পদচ্যুতি ঘটিল এবং সেই হইতে তাঁহার সম্মানজনক পদ পদ্মরঞ্জন অধিকার করিলেন।

বহু সাধারণ লোকের দ্রুত উন্নতির প্রধান কারণ আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার মনে হয় যে—সামাজিক সভ্যতার চাপে মানুষ যে প্রবৃত্তিগুলির পরিতৃপ্তি প্রকাশ্যে করিতে সাহসী হন না, সেই প্রবৃত্তিগুলিতে গোপনে ইন্ধন যোগাইয়া দিয়াই চতুর লোক সহজে বড় হইতে পারে।

অবশ্য পদ্মবাবুর উন্নতির একটি কারণ আছে, সেটি হইতেছে তাঁহার বুকের পাটা। যাহাদের সম্বন্ধে ইংরেজ কবি বলিয়াছেন—

"Fools rush in there where angels fear to tread" অর্থাৎ "দেবদূতেরা যেখানে সন্তর্পণে পা ফেলিতে কুণ্ঠিত হয় মূর্খেরা সেই স্থানে দৌড়াইয়া যাইতেও কুণ্ঠিত হয় না"—পদ্মরঞ্জন সেই শ্রেণির লোক। লেখাপড়া তেমন না জানিলেও পদ্মরঞ্জন বৈষয়িক ব্যাপারে মূর্খ নহেন। যেখানে স্বার্থের গন্ধ আছে সেখানে পদ্মরঞ্জন "কিল খাইয়াছি কিন্তু অপমানিত হই নাই"—একথা অম্লান বদনে বলিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার আটকায় না। শুনিয়াছি তারকেশ্বরের মোহান্তের পদ খালি হইলে তিনি ওই পদের জন্যও প্রার্থী হইবেন। বর্তমান মোহান্তের যোগ্য প্রতিনিধি বটে।

এই অল্পদিন পূর্বের কথাই ধরুন না কেন, কলিকাতায় কোন প্রসিদ্ধ কলেজে তিনি ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে লম্বা বক্তৃতা দিয়া আসিয়াছেন। শুনিয়াছি সভা ভঙ্গের পর ওই কলেজের কয়েকটি রসিক খ্রীস্টান ও হিন্দুর ছেলে জর্ডনের জল ও গঙ্গা জল মিশাইয়া, যে চেয়ারখানায় তিনি বসিয়াছিলেন তাহা ধুইয়া ঘরে উঠাইয়াছিল। অন্যান্য ছাত্রেরা হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে বলিয়াছিল। এই প্রকার বক্তৃতা দিতে যাওয়া কি কম্ বুকের পাটা? তাঁহার যে বিদ্যা তাহাতে যে বক্তৃতা তিনি পাঠ করিয়াছেন তাহা বুঝিবারই শক্তি তাঁহার নাই। তাঁহার বক্তৃতা লিখিয়া দেওয়ার [লোকের] অভাব নাই। কলিকাতার কোন কোন প্রসিদ্ধ কাগজের সম্পাদক মাসে মাসে নিয়মিত প্রণামী পাইয়া তাঁহাকে boom করিতে অর্থাৎ তাঁহার সম্বন্ধে ঢক্কা নিনাদে বাজার গরম করিয়া রাখিতে সর্বদাই প্রস্তুত, এই সকল বক্তৃতা লিখিয়া দিতেও তাঁহারা প্রস্তুত। এই প্রকার সাহস এবং প্রয়োজন হইলে সর্ব প্রকার সৎ অসৎ কার্য করিবার শক্তি তাঁহার আছে বলিয়াই লক্ষ্মী তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশন, জাতীয় বাণিজ্য সমিতির তিনি মেম্বার, আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের তিনি মেম্বার। গুণ না থাকিলে কি আর কেহ এত প্রতিষ্ঠানের মেম্বার হইতে পারে? আমার এক

রসিক বন্ধু বলিয়াছেন—"প্রয়োজন হইলে মেম বা'র করিতে পারেন বলিয়াই পদ্মরঞ্জন এত দলের মেম্বার।" কিছুদিন পূর্বে তাহার ভোটরঙ্গ, টাকাকড়ি সম্পর্কিত [একটি সংবাদ পত্র]জুয়াচুরির একখানা দলিলের ব্লক করিয়া ছাপাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এসব জাল জুয়াচুরিতে পদ্মরঞ্জনের কি হয়? ভোটরঙ্গ অতবড় একটা গুরুতর জুয়াচুরির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই বা তাঁহার কি করিতে পারিয়াছেন? তিনি ক্ষণজন্মা পুরুষ।

কি ভাবে নাম করিতে হয়, কি ভাবে কোথায় কী প্রকার ব্যয় করিলে চট করিয়া বেশি পরিচিত হইতে পারা যায় পদ্মরঞ্জন তাহা বেশ জানেন। তাঁহার এই বিদ্যা তিনি একেবারে আর্টে পরিণত করিয়াছেন। থিয়েটারের অভিনেত্রী যাহারা হয়, রূপ হিসাবে তাহারা প্রায়ই তৃতীয় শ্রেণির, কিন্তু তাহাদের সঙ্গ করিলে কাপ্তেন নাম সহজে জাহির হয়, কাজেই পদ্মরঞ্জন অভিনেত্রীর দলে ভিড়িয়াছিলেন।

প্রভাবশালী দুইচার জন লোককে হাতে রাখিলে, সময় অসময়ে ভোট প্রভৃতি ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়, সুতরাং তাহাদের ছেলেপিলেকে তিনি নিজের কোম্পানিতে চাকুরি দিয়া রাখিয়াছেন। প্রথমবার যখন ভোটে প্রতিযোগিতা করেন তখন তাঁহার দেশের প্রতিপত্তিশালী প্রায় সকল লোকের বেকার আত্মীয়ের চাকুরি করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়াছিলেন। তাঁর যে কী ক্ষমতা তাহা ত দেশের লোক জানে না! যে দলে আছেন তাহাতে এক দিনেই বঙ্গবিখ্যাত হওয়া সহজ, কাজেই সে দল ছাড়েন নাই। আবার অপর দল হইতে লাঠি গুঁতার আশঙ্কা আছে তাই গোপনে গোপনে নিজের দলের সংবাদ সেখানে পৌঁছাইয়া দিয়া তাহাদেরও মন রাখেন। নিজের দলের আদেশ অনুসারে কোন একটি প্রতিষ্ঠান তিনি ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু যেখানে তাঁহার স্বার্থ বিজড়িত, সে সকল প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করেন নাই। দেশকর্মী পদ্মরঞ্জন, দেশের অর্থ যাহাতে অপব্যয় না হয়, সেজন্য গত কলিকাতা কংগ্রেস এক্‌জিবিশনের সময়ে তাঁহার মাতার মৃত্যু-শয্যা পার্শে না যাইয়াও ন্যাস রক্ষকের কার্য করিয়াছেন। তিনি ছিলেন বলিয়াই টাকাগুলি অপরে নষ্ট করিতে পারে নাই। গর্ভধারিণী মাতা হইতেও ভারতমাতা তাঁহার নিকট কত বেশি প্রিয়! ভারতমাতার প্রতি এই প্রকার আকর্ষণ না থাকিলে কি দেশকর্মী আখ্যা পাওয়া যায়?

সুতরাং এহেন পদ্মরঞ্জনের উন্নতি হইবে না কেন? পদ্মরঞ্জনের জীবন-চরিত লেখা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষমতা নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের "মুচিরাম গুড়" হইতেও পদ্মরঞ্জন বেশি ভাগ্যবান। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে উপযুক্ত ভাষায় পদ্মরঞ্জনের জীবন চরিত লিখিতে পারিতেন। পদ্মরঞ্জনের জয় হোক।

দুঃখের বিষয় এই যে, এই বঙ্গবিখ্যাত লোকটি তাঁহার দলের খাতিরে এবং নাম কিনিবার জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিলেও ওই সকল ব্যক্তিই তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্বশুর-নন্দন ভিন্ন বলে না—বিবাহিত কি অবিবাহিত সকলেই এই মধুমাখা নাম বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে।

বর্তমান জীবন

কমলার সঙ্গ পরিত্যাগ করার পর আমি স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিতে লাগিলাম। কমলার সঙ্গে এতদিন থাকিয়া বেতন এবং উপরি পাওনা ইত্যাদিতে আমার প্রায় পাঁচ হাজার টাকা জমিয়াছিল। সেই টাকাটা আমি একটি বিশ্বাসী মহাজনের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম। তিনি আমাকে মাসে মাসে ২৫৲ করিয়া সুদ দিতে লাগিলেন। অর্থ সম্বন্ধে অনেক ঠেকিয়া শিখিয়া আমি অনেকটা হুশিয়ার হইয়াছিলাম। এবার সংকল্প করিলাম যে ওই টাকাতে আর হাত দিব না। একটি অফিসার মেসের কক্ষ ভাড়া লইলাম। এম. এ. পাশ করিলেও চাকুরির বাজারে দেখিলাম আমার মূল্য খুবই কম। কমলার সঙ্গে থাকিয়া আমার পরিচয় হইয়াছিল, কাপ্তেন-বিলাসী-লম্পট বাবুদের সঙ্গে। যাঁহারা সদ্ভাবে জীবনযাপন করিয়া কমলার কৃপালাভ করিয়াছেন, সেই সমুদয় লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটিলেও তাঁহারা আমায় ঘৃণা করিতেন। চাকুরির বাজারে আমার বিশেষ সুবিধা হইল না অথচ খাইতে হইবে, থাকিতে হইবে, নেশার অভ্যাসটা তখনও ছাড়িতে পারি নাই, তাহারও খরচ আছে, কাজেই একটা কিছু না করিলেও চলে না। সুতরাং আমি তখন সেই ব্যবসাই অবলম্বন করিলাম, যাহা করা আমার পক্ষে একমাত্র সম্ভব ছিল, অর্থাৎ “বেশ্যার দালালি”। আমার পাঠকগণ অনেকেই হয়তো জানেন না যে এটা কি ব্যাপার। তাঁহারা শুনিলে আশ্চর্য হইবেন যে কলিকাতার ভদ্রবেশধারী একদল লোক আছে যাহাদের জীবিকাই নির্বাহ হয় কাপ্তেন এবং লম্পটবাবুদের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য নূতন নূতন বেশ্যা সংগ্রহ করিয়া দিয়া। যাহারা কাপ্তেনি করিতে করিতে পাকা হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি আবার বেশ্যাতে হয় না, তাঁহারা গৃহস্থ ঘরের চরিত্রহীনা স্ত্রীলোক কামনা করেন। এই সকল দালাল সেই প্রকার স্ত্রীলোকও জোটাইয়া দিয়া অর্থ উপার্জন করিয়া থাকে। বেকুব বাবু পাইলে বেশ্যার হাতের বালা চুড়ি খুলিয়া তাহাকে থান কাপড় পড়াইয়া ভদ্রঘরের বিধবা পরিচয় দিয়া অনেকে বেশ ভাল রকম অর্থ আদায় করিয়া লইয়াছে, ইহাও আমি চোখের উপর দেখিয়াছি। ভদ্রঘরের চরিত্রহীনা স্ত্রীলোক আনিয়া—এমন কি অনেক সময় বেশ্যাকে ভদ্রমহিলা সাজাইয়া, এই সকল দালাল ‘ইহাই তাহার প্রথম অভিসার’ এই কথা বুঝাইয়া মূর্খের নিকট বহু টাকা লুটিয়াছে, ইহাও আমি জানি। দালালি ভাষায় এই প্রকার স্ত্রীলোকের নাম “Untouched”। অর্থাৎ একটি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ স্পর্শ [সেই নরীকে] করে নাই। কাপ্তেন বাবুদের নিকট এই “Untouched”-এর মূল্য খুব বেশি। শুনিলে আপনারা আশ্চর্য হইবেন, বাংলার কোন পত্রিকার সম্পাদক—এই ব্যবসা করিয়া বেশ দুপয়সা উপরি রোজগার করিতেছেন।

আমিও এই দালালি করিতে আরম্ভ করিলাম। তাহাতে আমার বেশ দুপয়সা উপার্জন

হইতে লাগিল। এই প্রসঙ্গে লম্পট জগতের আর একটা বিশেষত্বের পরিচয় পাঠকগণকে না দিয়া পারিতেছি না। হিন্দুস্থানি বেশ্যাদের মধ্যে (সাধারণত যাহারা বাইজী পর্যায়ে উন্নত তাহাদের মধ্যে) প্রথম পুরুষ সঙ্গ করার একটা Ceremoney অর্থাৎ বিহিত প্রথা আছে। সেই ব্যাপারকে "নথ্‌নি খসান" বলে। এই নথ্‌নি খসান ব্যাপারে মেয়ের অভিভাবিকা বা মাতা বেশ দুপয়সা লাভ করে। যে লম্পট বেশি অর্থ দিতে স্বীকৃত হয়, নথনি খাসাইবার সৌভাগ্য এবং গৌরব তাহারই লাভ হয়। কলিকাতার উত্তর অঞ্চলের কবিরাজ গোবর গণেশ সেনশর্মা একবার এক বাইজী কন্যার নথ্‌নি খসাইয়া দক্ষিণা দিয়াছিলেন পাঁচশত টাকা। এই গোবর গণেশের আরও অনেক কীর্তি আছে। একটি নার্স তাঁহার প্রেমে পরিয়াছিল, নার্সটির পায়ে গোদ ছিল কিন্তু সম্পত্তি ছিল প্রায় আশি হাজার টাকা মূল্যের। সেই গোদ্‌ সুশোভিত পায়ে প্রাণ সমর্পণ করিয়া গোবর গণেশ ওই সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। যাক্‌ এসব কথা, যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি।

বিপদ কখনো একা আসে না। যে মহাজনের নিকট আমি আমার টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম—এই সময়ে তিনি দেউলিয়া হইলেন—আমার শেষ সম্বল যাহা তাঁহার নিকট ছিল তাহাও গেল।

আমার জীবনব্যাপী পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। কখনো রাস্তায় ফুটপাতে, কখনো কোন পূর্ব পরিচিত বেশ্যার দাওয়ায়, কখনো ধর্মশালায় রাত্রি যাপন করি, আহার কোন দিন জোটে, কোন দিন জোটে না। মানসিক অশান্তিতে, রোগের যন্ত্রণায় ও ক্ষুধার তাড়নায় কতদিন আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি, কিন্তু কাপুরুষ আমি, তাহাও করিতে পারি নাই। কলিকাতার ঘৃণিত পল্লীতে পূর্ব-জীবনের পরিচিত কোন একটি বেশ্যা তাহার নীচের তলার একটি স্যাঁতসেঁতে ঘরে দয়া করিয়া থাকিতে দিয়াছে, সেইখানেই থাকি। অন্য নেশা অনেক পূর্বেই ছাড়িয়াছিলাম। আফিম প্রায় সিকি ভরি দৈনিক না হইলে চলে না।

একটি পুরাতন গল্প আছে যে—এক ব্রাহ্মণ মানুষের কপাল ফলকে—বিধাতার লেখা পড়িতে পারিতেন। একদিন রাস্তায় একটি নরকপাল পড়িয়া আছে দেখিয়া তিনি কৌতূহলবশত তাহার কপালের লেখা পাঠ করিলেন ; দেখিলেন তাহাতে লেখা আছে—

ভোজনং যত তত্রশ্চ শয়নং হট্ট মন্দিরে।
মরণং গোমতী তীরে অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি।।

অর্থাৎ—"ইহার যেখানে সেখানে ভোজন হইবে, হাটের কুঁড়ে ঘরে শয়ন হইবে, গোমতী তীরে মরণ হইবে (অর্থাৎ যেখানে মরিলে নরক) এবং ইহার পর আরও কিছু হইবার সম্ভাবনা আছে।" ব্রাহ্মণ খুবই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন—ভিক্ষান্নে জীবনযাপন, মাথা পাতিবার আশ্রয় না থাকায় হাটের কুঁড়ে ঘরে শয়ন, মৃত্যুর পরও নরক বাস, ইহার পর আরও কী হইতে পারে তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি নরকপালটি কুড়াইয়া বাড়িতে লইয়া গেলেন এবং তাঁর গোশালার পশ্চাদ্ভাগে একটি গামছায় জড়াইয়া ঝুলাইয়া রাখিলেন এবং প্রতিদিন একবার করিয়া সেইখানে যাইয়া নরমুণ্ডটি দেখিয়া

আসতেন। ব্রাহ্মণের স্ত্রী অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্তা ছিলেন, তিনি—ব্রাহ্মণ রোজই ওই স্থানে যাইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকেন দেখিয়া সন্দেহবশত অনুসন্ধান করিতে যাইয়া ওই নরকপাল দেখিতে পাইলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন যে এই নরকপালটি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের কোন গুপ্ত প্রণয়িনীর। মৃত্যুর পরও তাহাকে ভুলিতে পারে নাই, মুণ্ডটি আনিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। নরকপালটি পদাঘাতে চূর্ণ করিলেন, তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সেই চূর্ণিকৃত মস্তক পায়খানার মলের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ পরে ব্যাপারটি যখন জানিতে পারিলেন তখন তাঁহার দুঃখও হইল, হাসিও পাইল। তিনি কেবল মাত্র বলিলেন যে—

—'অপরস্বা কিং ভবিষ্যতি" এখন বুঝিতে পারিলাম।

আমার অবস্থা এখন ওই নরকপাল যাহার ছিল তাহারই মত। মৃত্যুর পর আর কী আছে তাহা জানি না। এখন যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি তাহার চেয়েও বেশি যন্ত্রণা কি বৈতরণীর পরপারে আমার জন্য সঞ্চিত আছে? যে যন্ত্রণা, যে শত সহস্র বৃশ্চিক দংশন এখন আমি সহ্য করিতেছি তাহাতেও কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? কে বলিবে—কে আমার প্রশ্নের উত্তর দিবে! উত্তর নাই, পাইব কিনা জানিনা। ইহজীবনের যাতনা দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে, অনাগত পরজীবনের বিভীষিকাময়ী কল্পনায় মৃত্যুকেও সাদরে আহ্বান করিতে পারিতেছি না ইহাই আমার বর্তমান জীবন।

উপসংহার

আমি লেখক নহি, সাহিত্যিক নহি। ভাষার ঝঙ্কারে, আর্টের প্রাচুর্যে পাঠকগণকে মুগ্ধ করিবার শক্তি আমার নাই। জীবনে যাহা ঘটিয়াছে, যাহা উপলব্ধি করিয়াছি, যাহা দেখিয়াছি, যাহা শুনিয়াছি সোজা কথায় তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। কোন পাঠকের মার্জিত রুচিতে আঘাত লাগিলে তিমি আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

এই পুস্তক কেন লিখিলাম তৎসম্বন্ধে পুস্তকের প্রথমে যে কৈফিয়ত প্রদান করিয়াছি. তদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। পূর্বে কী ছিল বলিতে পারি না, কিন্তু আমার জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এবং বিশ্বস্ত বন্ধুগণের অভিজ্ঞতার ফল হইতে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমাদের হিন্দু সমাজের উচ্চ হইতে নিম্নতম সর্বপ্রকার স্তরের মধ্যে একটা ব্যভিচারের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। এই পুস্তকের মধ্যে আমি কতকগুলি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি। পাঠকগণের অবগতির জন্য আরও কয়েকটা ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে এই উপসংহারে উল্লেখ করিব!

বাংলার সর্বজন পরিচিত খড়দহের গোস্বামী বংশের সরযূ নাম্নী কন্যা শিষ্যপুত্রের সঙ্গে কুলের বাহিরে আসিয়া প্রকাশ্যে বেশ্যাবৃত্তি করিতেছে। দেশের মধ্যে বিশেষভাবে পরিচিত উচ্চ রাজবংশের গৌরবময় আসনের অধিকারী জনৈক রাজা বাহাদুর, আমরা তাঁহাকে পাঁচকোটির অধীশ্বর বলিব, তিনি তাহাকে রক্ষিতাভাবে আশ্রয় দিয়াছেন। ভাবনীপুরের বিখ্যাত ব্যারিস্টার ঘোষবর্মা পরিবারের কন্যা কিছুদিন হইল পলায়ন করিয়াছেন।

একজন বিখ্যাত হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কন্যা বিবাহিতা হইয়াছিলেন চট্টোপাধ্যায় বংশের একজন ডাক্তারের সঙ্গে। এই ডাক্তার যাঁহার নাম আমরা দয়াময় চট্টোপাধ্যায় বলিব, তিনি কোন একটি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। মহিলাটি নবাববংশীয় এক মুসলমান যুবকের সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়াছেন। শ্যামবাজারের সেন শর্মা পরিবারের কন্যা কুমারী গৌরী দেবী অপ্রকাশ্যে বেশ্যাবৃত্তি করিতেছেন। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব কোন বিখ্যাত বিচারপতির পুত্র রক্ষিতা বেশ্যা মণিমালাকে লইয়া প্রকাশ্যে দিল্লিতে এসেম্বলির অনেক সভায় যোগদান করিয়া থাকেন।

গৌরীশঙ্কর লেনের রেণুবালা পিতৃপরিচয়ে হাইকোর্টের এক জজের নাম বলে। রেণুর দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তি আছে—বর্তমান সময় যে রাজকুমার তাহার নিকট আছেন তিনিও ষাট হাজার টাকা দিয়াছেন।

পুস্তকে কয়েকটি উচ্চশ্রেণির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, নিম্নশ্রেণির রমণীদের কথা সকলেই

জনেন—শতকরা ৯৫টিই বেণে, সাহা, নাপিত, ধোপা, পোদ, কেওড়া প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির মেয়ে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমি বলিতে বাধ্য যে ব্যক্তিগত ভাবে আমি কমলার কথা ঠেলিয়া ফেলিতে পারি না, আমার নিজ জীবনের এবং বন্ধুবান্ধবগণের অভিজ্ঞতা হইতে যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে স্ত্রী এবং পুরুষের যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা পরস্পরের সহিত যদি অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায় তাহা হইলে তাহাদের মানসিক প্রবৃত্তি তাহাদিগকে অধঃপতনের পথে টানিয়া লইয়া যায়। আমাদের শাস্ত্রকারগণ মূর্খ ছিলেন না—নারীকে ঘৃতকুম্ভের সহিত এবং পুরুষকে তপ্ত অঙ্গারের সহিত তুলনা করিয়া তাহাদিগের অবাধ মেলামেশার বিরুদ্ধে যে বাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন সেই বাণী অভিজ্ঞতাপ্রসূত তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার এই জীবন কথাতে যে সমুদয় ঘটনা উল্লেখ করিয়াছি তাহা হইতেই পাঠকগণ আমার কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। রমলার অধঃপতনের কারণ, সে পল্লীগ্রামের কন্যা, বয়স্থা অবিবাহিতা পল্লীজীবনের কন্যার স্বাধীনতা বধূগণ হইতে অনেক বেশি, সুতরাং অবাধ মেলামেশার সুযোগ তাহার যথেষ্ট ছিল। উষা স্বাধীন জেনানা দলের মেয়ে, অবাধ মেলামেশাই তাহার সমাজের নীতি, মনোরমা এবং পরিমলও ওই দলের, সুতরাং তাহাদেরও ওই অবাধ মেশার ফলে পতনের সুযোগ ঘটিয়াছিল। সিংহকন্যা রমলা গুপ্তা, বরিশালের শোভনা হরণ, লীলাবতী হরণ, বি. এ. উপাধিকারিণী পদ্মকুমারী সিংহের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ অহল্যা হরণ প্রভৃতি যতগুলি উচ্চশ্রেণির হিন্দুবালিকার পতন ঘটিয়াছে তাহার মূলে ওই অবাধ মেলামেশাই মুখ্য কারণ।

বরিশালের গুহ বংশীয় ঢাকার এক বিশিষ্ট উকিলের পুত্র কলিকাতা হইতে এম. এ. পাশ করিয়া বিলাতে বিশেষ সম্মানের সহিত পি-এইচ. ডি. প্রভৃতি উপাধি পাইয়া পাঞ্জাবের কেনে কলেজে ৫০০ টাকা বেতনে প্রফেসারি চাকরি পান। এই সময়ে অন্য এক প্রফেসারের সঙ্গে তাঁহার খুব বন্ধুত্ব হয়, ফলে প্রফেসার পত্নী ইহার সঙ্গে সান্ধ্যভ্রমণ ইত্যাদিতে যোগ দেন। বন্ধুর মোটর সাইকেলেও এই প্রফেসারপত্নী বেড়াইতে যাইতেন ; বন্ধুর এই প্রকার আন্তরিকতায় স্বামী খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। হঠাৎ একদিন পত্নী তাঁহার স্বামীকে বলিলেন—"আমি তোমাকে মোটেই পছন্দ করি না, আমি প্রভুর সঙ্গে থাকিব।" যে কথা সেই কাজ। তিনি আর স্বামীর ঘর করিলেন না, প্রভুর সঙ্গে রহিলেন। দুর্ভাগ্য, এই ঘটনা প্রকাশ হওয়ায় প্রভুর চাকুরি গেল। প্রভু বন্ধুপত্নীকে লইয়া এখন কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। তাঁহার দুইটি সন্তান পিতার সঙ্গেই রহিয়াছে। প্রেমিক যুগল এখন খুব অর্থকষ্টে আছেন। এই মেয়েটি কোন অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের জজের কন্যা।[২৩] ইহা অবাধ মেলামেশার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কমলার কথা কমলা নিজমুখেই বলিয়াছে, সুকৃতিও কমলার পদানুসরণই করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা এই বিষয়টি একটু অবহিত হইয়া চিন্তা করিবেন তাঁহারাই জানিতে পারিবেন যে অবাধ মেলামেশাই এই সকল ব্যভিচারের মুখ্য কারণ।

কত আর বলিব? যে সমুদয় ঘটনা জানি তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে গেলে আর একখানা প্রকাণ্ড পুঁথি লিখিতে হয়। নারীজাতির দুঃখে নানাস্থানে কর্ম্মমন্দির, সেবাশ্রম, উদ্ধারাশ্রম, সমিতি প্রভৃতি স্থাপিত হইতেছে কিন্তু তাহার একটার মধ্যে যে কি ব্যভিচার স্রোত চলিতেছে যে, মানদা তাহার আত্মচরিতে খুলিয়া বলিয়াছে। আমিও অনেক জানি, দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত এই প্রকার একটি আশ্রমে শান্তিপুর হইতে উমা দেবী দেশের ডাকে গৃহের ডাক তুচ্ছ করিয়া আগমন করিয়াছিলেন। দেশবন্ধুর দলের জনৈক কায়স্থ কুলতিলক যিনি এসেম্বলির হুইপ হইয়াছিলেন, তিনি রুদ্ধকক্ষে উমাদেবীকে গীতা পড়াইতেন। শ্রীযুক্ত বসন্ত সরকার মহাশয় এই কেলেঙ্কারি জানিতে পারিয়া দেশবন্ধুকে তাহা জানান এবং উমাদেবী তাড়িতা হন। উপরোক্ত মিত্র মহাশয় তখন উমাদেবীকে লইয়া পশ্চিমে গমন করেন এবং সপুত্র প্রত্যাগমন করেন। উমাদেবীর স্বামী স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইতে আসিয়া অনেকবার গলা ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া যান।

আর বাড়াইতে চাই না। এই ব্যভিচার স্রোত সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কোথায় এই স্রোত রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন, তাহার পরিবর্তে অতি আধুনিক তরুণ সাহিত্যে এমন ভাবে যৌন সম্মিলনের চিত্তাকর্ষণকারী চিত্র অঙ্কিত করা হইতেছে। যাহাতে তরুণবয়স্ক যুবক যুবতী পাঠক পাঠিকার মনে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইতেছে। আধুনিক তরুণ সাহিত্যের কাটতি দেখিয়া প্রাচীনপন্থী লেখকও এখন তাঁহাদের অনুকরণে সেইভাবে কলম চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই তরুণ সাহিত্যের প্রচার জন্য কয়েকখানি পত্রিকা বাজারে প্রকাশিত হইতেছে, শুধু তাহাই নহে পুরাতন এবং বহুল প্রচারিত কয়েকখানি মাসিক পত্রিকাও দেখিতেছি ওই জাতীয় গল্প প্রবন্ধে নিজ নিজ কলেবর সুশোভিত করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। ইহার পরিণামে আমার ন্যায় সহস্র সহস্র রমেশচন্দ্র সৃষ্টি হইবে সন্দেহ নাই।

দুই একখানি পত্রিকা কেবলমাত্র এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবে কি না জানি না। প্রথমই এই সম্পর্কে নাম করিতে হয় সঞ্জীবনী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের। এই ঋষিকল্প বৃদ্ধ সময়ে অসময়ে স্থানে স্থানে প্রাণপণে এই ব্যভিচার স্রোত রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক নাট্যাভিনয়ের প্রতিও তীব্র কশাঘাত করিতে ইনি কুণ্ঠিত হন নাই। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে আজ ওই নাট্যাভিনয়ের ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে। তরলমতি যুবক-যুবতীরা প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে মিলিয়া মিশিয়া পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া অভিনয়ের অনুরোধে পরস্পরের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যৌন ক্ষুধার অগ্নিতে ইন্ধন প্রদান করিতেছে, আর সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ সেই রঙ্গমঞ্চের দর্শকের আসনে বসিয়া তাহাদিগকে বাহবা দিতেছেন। আমার বেশ মনে আছে কমলা তাহার আত্মজীবন কাহিনি আমাকে বলিতে বলিতে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল—

—"পারিবারিক থিয়েটারই আমার সর্বনাশের প্রধান কারণ। তাহাতে ঘনিষ্ঠতার ফলেই

আমার লালসার আগুন প্রথম জ্বলিয়া উঠিয়াছিল আর তাহা নিবাইতে পারি নাই। নারীত্বের গর্ব সেইখানেই প্রথম ধুলায় লুটাইয়াছিল।"

আমার পাপ জীবনের চিত্রকে আমি সর্বসমক্ষে উদঘাটিত করিয়া দেখাইতেছি। যাঁহারা সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং সমাজের সংস্কারপ্রয়াসী তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া কোন্ কোন্ ছিদ্রপথে কেমন করিয়া পাপ প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়। চাঁদ সদাগর যদি লোহার বাসরের ক্ষুদ্র রন্ধ্রটুকুর কথা পূর্বে জানিতেন তাহা হইলে লক্ষ্মীন্দ্রকে কালনাগিনী কাটিতে পারিত না। আজ আমাদের সমাজের শত শত লক্ষ্মীন্দ্র (লক্ষ্মী ছেলে কালে ইন্দ্রতুল্য হইতে পারিত) ব্যভিচার কাল নাগিনীর বিষে জর্জরিত হইয়া প্রাণ হারাইতেছে। স্কুল কলেজ বোর্ডিং-এর লৌহ বাসরে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া তাহাদিগের অভিভাবকরূপী চাঁদ সদাগর নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছেন। কিন্তু যে রন্ধ্রপথে কাল নাগিনী আসিয়া দংশন করিতেছে তাহার সংবাদও তাঁহারা রাখিতেছেন না। অমার এই জীবন কথা যদি তাঁহাদিগকে সেই রন্ধ্রগুলি দেখাইয়া দেয় এবং তাঁহারা যদি আমার জীবনের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া তাঁহাদের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা স্থূল স্নেহের পুতুলগুলির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সেই সকল রন্ধ্রগুলি বন্ধ করিতে চেষ্টিত হন তাহা হইলে আমার জীবনব্যাপী পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

পরিশিষ্ট

মানদা-রমেশদা'র

চাপান-উতোর

পটভূমি : মানদা দেবী ও রমেশচন্দ্রর বই দু'টির প্রথম প্রকাশকাল জানা নেই। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ দেখবার সুযোগ থাকলে হয়তো তথ্যটি পাওয়া যেতো।

বই দুটি অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য দেখে অনুমান দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর ১৯২৫/২৬ থেকে ১৯৩০ সালে মানদা দেবীর বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। মনে হয় রমেশচন্দ্রর বইটি রমেশচন্দ্রর কথা অনুসারে 'শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত'-এর ''....খুবই কাটতি হইয়াছে, পর পর চার পাঁচটী সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থখনি হিন্দিতে এবং ইংরেজীতেও অনুবাদিত হইয়াছে." (দ্র. পৃ. ১৭৫) সুতরাং 'আত্মকথা' মানদা দেবীর বই প্রকাশের বেশ পরে প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা মানদা দেবীর বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ এবং রমেশচন্দ্রের বইয়ের পঞ্চম সংস্করণ মাত্র দেখবার সুযোগ পেয়েছি। এই সংকলনে মানদা দেবী ও রমেশচন্দ্রর বই-এর পাঠ এই দুই সংস্করণের (না পুনর্মুদ্রণ?) পাঠানুযায়ী। বানানের ক্ষেত্রে আমরা স্বাধীনতা নিয়েছি।

২

প্রকৃতপক্ষে মানদা-রমেশদার চাপান-উতোরের পালা শুরু হয়েছে ১৯১৪ সালে। রমেশচন্দ্র জানিয়েছেন : "বাংলা ১২৯২ সনের ৩০শে আশ্বিন তারিখে হুগলী জেলায়...গ্রামে আমার জন্ম হয়, আমার পিতা বিশেষ সঙ্গতিপন্ন না হইলেও একেবারে দরিদ্র ছিলেন না।' (দ্র. পৃ. ১২১)। অর্থাৎ রমেশচন্দ্র ১৮৮৫ খ্রিস্টিয় সনের অক্টোবর মাসে ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

অপরদিকে মানদা দেবীর কথায়, "১৩০৭ সালের ১৮ই আষাঢ় তারিখে আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা কলিকাতার এক সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্রাহ্মণ। আমি তাঁহার প্রথম সন্তান। পিতার নাম ও পরিচয় প্রকাশ করিতে অক্ষম।...আমার পিতামহ একজন সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। কলিকাতাতে তাঁহার চারিখানা বাড়ি এবং নগরের উপকণ্ঠে একখানা বাগানবাড়ি ছিল। তিনি বৃদ্ধ বয়েসে রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।...আমার পিতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার পসার বেশ জমিয়া উঠে।" (দ্র. পৃ. ২১)।

অন্যদিকে রমেশচন্দ্রর বাবা 'বর্ধমানের মহারাজাধিরাজের অধীনে বাৎসরিক প্রায় দেড় হাজার টাকা আয়ের পত্তনি তালুকের মালিক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত গ্রামে আমাদের একটি বড় জোত ছিল।' (দ্র. পৃ. ১২১)। বেথুন স্কুলের ছাত্রী মানদা যখন পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী (সেকালের কথায় ষষ্ঠ শ্রেণির) তখন তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। মেয়ের ও সংসারের

তত্ত্বাবধানের জন্য মানদা দেবীর বাবা তাঁর বড় বোনকে নিয়ে আসেন। মানদার দেবীর ভাষায়, 'আমাকে দেখাশুনা করিবার নিমিত্ত আমার বিধবা পিসিমা আসিয়াছিলেন। তিনি আমার পিতার জ্যেষ্ঠা ভগিনী। আমার যাহাতে কোনো কিছুর অসুবিধা না ঘটে, সে বিষয়ে তিনি সর্বদা দৃষ্টি রাখিতেন।' (দ্র. পৃ. ২৬)।

মানদা দেবী ছিলেন বাবার আদরের দুলালি। কিন্তু অবস্থাগতিকে তাঁর মার মৃত্যুর প্রায় এক বছর বাদে, বাড়িতে বিমাতা আসলেন। ধীরে ধীরে মানদা দেখলেন, আগের মত তিনি বাবার সঙ্গ পাচ্ছেন না। যদিও বিমাতা তাঁর সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করতেন না। কিন্তু তারপর তাঁর একমাত্র সাথী ছিল মামাতো ভাই নন্দদা। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা তাঁকে স্কুল ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই পরে আবার তিনি তাঁকে এক ক্লাস নিচুতে বেথুন স্কুলেই ভর্তি করে দেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মানদা ও তাঁর মামাতো ভাই নন্দলালের অধ্যয়ন সংক্রান্ত তথ্যে সামান্য তারতম্য ত্রুটি আছে।

যা-হোক, ধীরে ধীরে মানদা প্রত্যক্ষভাবে পিতৃসান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হলেন। যদিও মেয়ের প্রতি বাবার জাগতিক সমস্ত কর্তব্য তিনি করতেন।

এই ভাবেই বালিকার মনে ক্ষোভ-দুঃখ জমতে লাগলো। এবং শিক্ষক মুকুলদা, নন্দদার সান্নিধ্যে এবং বিমাতার বাপের বাড়ি থেকে আগত খাস দাসী (নামে মাত্র) হরিদাসী মানদাকে বা মানদার আচার-ব্যবহার পছন্দ করতে না পারায়, তার সঙ্গে মানদার সম্পর্ক 'মধুর' ছিল না।

ইতিপূর্বেই মানদাদের দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি রমেশচন্দ্র চাকুরির সুপারিশ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন।

মানদার তেরো বছরের জন্মদিনের পর থেকে সিনেমা-থিয়েটারে রমেশচন্দ্র ও মানদা-নন্দদা-গৃহশিক্ষক মুকুলদার সঙ্গে নিয়মিত সঙ্গী হয়ে উঠেছিলেন রমেশচন্দ্র।

পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, রমেশচন্দ্রর মানদাদের সঙ্গে নৈকট্যের আগের জীবনের কথা তাঁরই 'আত্মকথা' অনুসারেও কদর্য ছিল।

মানদা অকপটে লিখেছেন, 'আমার যৌবনোদ্ভব হইয়াছিল। অভিভাবকের অসাবধানতা [না অবহেলায়?] ও অনুকূল পবনে যথাসময়ে আমার হৃদয়ের মধ্যে প্রবৃত্তির অনল জ্বলিয়া উঠিল, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।' (দ্র. পৃ. ৩২) এবং লক্ষণীয়, 'আমাব প্রথম যৌবনের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে **সম্মুখে দেখিলাম দুইটি যুবক—মুকুল ও রমেশ**। প্রকৃতির নিয়মে ইহাদের দিকে প্রবৃত্তির প্রবাহ প্রবল বেগে ছুটিল।...**মুকুলদা একটু ভীরু স্বভাব। রমেশদা ছিল সাহসী** ও বেপরোয়া।' (দ্র. পৃ. ৩৬-৭)।

তারপরের কাহিনি তো পাঠকের জানা। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানদা দেবীর চাপান বিচার করাই উচিত।

মানদার প্রথম চাপান ১. রমেশদা তাঁকে কুলত্যাগিনী করেছেন। ২. রমেশদা তাঁকে মিথ্যা কথা বলেছিলেন। 'মানি, আমি চার মাসের ছুটি নিয়েছি। চলো পশ্চিমে যাই।' তার আগে বলেছিলেন, 'একদিন রমেশদা আমার নিকট প্রস্তাব করিল আর তো এ বাড়িতে হতে পারে না। এমন স্থানে চলো, যেখানে নিত্য তোমায় দেখব...আমি কোনো উত্তর না দিয়া রমেশদার গলা জড়াইয়া তাঁর বুকে মাথা লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম।' (দ্র. পৃ. ৩৭)

মনে রাখতে হবে ইতিমধ্যেই মানদা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্রর উতোর কি? তিনি তাঁর 'আত্মকথা'র "মানদা ও আমি" অধ্যায়ে সোজাসাপটা বলেছেন : 'প্রায় মাসাধিক কাল তাহাদের বাড়িতে থাকিয়া পরে বোর্ডিং-এ গিয়াছিলাম। এই সময়ের মধ্যেই জানিতে পারিলাম যে মানদার কুমারীধর্ম অক্ষত নাই। মুকুলই তাহার গুপ্ত প্রণয়ী।...যদি না জানিতাম যে মানদা পতিতা হইয়াছে তাহা হইলে হয়ত মানদার সর্বনাশ করিবার প্রবৃত্তিই আমার প্রাণে জাগিত না।... সে নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত বলিয়া [জ্ঞাতি-আত্মীয়তা] আমি খুব সম্ভব আপনাকে সম্বরণ করিয়াই চলিতাম,.. মানদা কিন্তু মুকুলের সঙ্গে তাহার সম্পর্কের কথা একেবারেই চাপিয়া গিয়াছে।' (দ্র. পৃ. ১৭৬)।

এই প্রসঙ্গে মানদা ও রমেশচন্দ্রর বয়ানে ফারাক আছে। আমরা জেনেছি মানদার বিবরণ থেকে, যেদিন মানদা-রমেশের মধ্যে যৌনমিলনের ইঙ্গিত আছে, মানদার ভূমিকা ছিল প্রশ্রয় দানের। রমেশ ছলনা বা বলপ্রয়োগ করেছিল এমন অভিযোগ নেই। বরং তারপর থেকে পারস্পরিক আকর্ষণে তারা মিলিত হত। অন্তঃসত্ত্বা হবার পর রমেশচন্দ্রর পক্ষে যে কাজটা স্বাভাবিক ছিল, তা হচ্ছে মানদার সঙ্গে সম্পর্কছেদ অথবা গোপনে 'গর্ভপাত' করানোর চেষ্টা করা। এখানে রমেশচন্দ্রর চাকরি উপলক্ষে মানদার বাবার উপকার গৌণ। মানদার গৃহত্যাগের কারণের জন্য রমেশকে একা দায়ী করা চলে না।

মুকুল সম্পর্কে রমেশের কথা বিবৃতি মাত্র। তার কোনো প্রমাণ নেই। 'আত্মকথা'র সঙ্গে সংযুক্ত একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় **মুকুলদার মর্মকথা** নামক একটি বই, বিজ্ঞাপনে ঘোষিত 'মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত। **মানদা ও রমেশদা যাহা গোপনে করিয়াছিলেন, মুকুলদা তাহাও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।**'

চাপান-উতোরের অন্য অভিযোগ রমেশচন্দ্রর চাকরি থেকে ছুটি, অফিসের তহবিল তছরূপ, মানদাকে অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়া, লাথি মারা ইত্যাদি প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্রর মিথ্যাচার 'আত্মকথা'র পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন।

সুতরাং মানদা দেবীর চাপান-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ মানদার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় গৃহ/কুল ত্যাগের উপলক্ষ রমেশচন্দ্র। পরবর্তীকালে রমেশচন্দ্রর উতোর তাঁর 'আত্মকথা' অনুসারেই ধোপে টেকে না।